চিন্তামণি

এক

খিদিরপাড়া
২৪ পরগণা
তাং ২০শা শ্রাবণ

বৈন চিন্তামণি তুমি ২/৩ খানা চিঠি দিয়াছ তাহা আমি পাইয়াছি। আমি ডায়মণ্ডহারবার যাইব বলিয়া পত্রখানার উত্তর দিতে গৌণ হইল, দাদার আমশা ১ মাস যাবত ভুগিয়াছে, আমি কাহাকে লইয়া যাইব। বর্ত্তমানে অসুখ সারিয়াছে। আজ ৫/৭ দিন যাবত এখানে ঝড় তুফান হইতেছে এইরূপ অবস্থাতে আমি কি করিয়া যাইব। নৌকা যে করিয়া যাইব এমন সাধ্য আমার নাই। ২/১ দিনের মধ্যেই আমি যাইব, ওখান হইতে আসিয়া আমি মাল লইয়া তোমার নিকট পত্র দিব। একা লোক খালি ঘর ফেলিয়া ১টি গাভি ফেলিয়া আমি কি করিয়া যাইব। এই দুর্দ্দিনে আমি তোমাকে আনিয়া রাখিতে পারিলাম না। তুমি পেটের খুধায় মধুবণী গিয়াছ, এই দুক্ষ আমারই অন্তরে জানে। আমি কি হুঁসে আছি তাহা ভগবানই জানে। উহাদের তিন জন যাওয়াতে আমার শরিলে একটুক বল পাইতেছি না। চাঁপাবালা বসিরহাট গিয়া শ্বশুড়ের বাসায় ১৫ দিন মাত্র ছিল, উহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। সোণার গয়ণা ইত্যাদি না নেওয়াতে মানে আর কি বুঝিয়া লইবে। হেমীকে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে। বৈশাখ মাসের ২০ তাং গিয়াছে জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৭ তাং বিবাহ দিয়াছে। হেমীর মাকে বিবাহেতে লয় নাই। হেমীর মা তাহার কাকার বাড়ীতে আছে। ডাকাতের হাতে হেমীকে বিবাহ দিয়াছে ঐ শোকে হেমীর মা পাগল হইয়াছে। হেমই বা কত কান্দাকাটি করিয়াছে উহার মাঐ বা কত কান্দাকাটি করিয়াছে, কাকী ধরিয়া স্নান করায় ও খাওয়ায় এই অবস্থাতে আছে। ছেলের বাড়ী মোদের দেশে বিন্দীপাড়া বিপিনের ভাই। এই মেয়ার বিবাহে কত আমোদ আহ্লাদ করিব। তাহার মধ্যে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়া এইরূপ কার্য্য করিল। হেম যে মায়ের জন্য কি প্রকার কান্দাকাটা করিয়াছে। তাহা আর এই ক্ষুদ্র পত্রে কি লিখিব। তবু চাঁবাকে বাড়ীতে লইল না। জামাতার মুখ দেখে নাই বিবাহের নিয়ম কাজ মায়ে করে তাহাও করে নাই। আমি এই অশান্তিতে আছি তুমি সর্ব্বদা পত্র দিবে। তোমার পত্র পাইলে একটু শান্তিতে থাকি। মেয়ে জামাই লইয়া বাড়ীতে আসে নাই তাহার জন্য আশীর্ব্বাদ করিও। তোমাকে জানাইব। টাকা ত লইয়া যায় নাই। নবিন আষাড় মাসে ধান্যের কাজ করিয়া ১০৲ টাকা দিয়াছে কি কাজ করে জানি না। চাঁবার পত্র পাই নাই। আমার খাওয়া চলে না।

"দিদি"

চিঠি পড়ে পটল বলে, লেখাটি কার রে ? কুচি কুচি লিখতে জানে পিঁপড়ের ঠ্যাং।

নন্দ গোঁসাই হবে। আগে নিত এক পয়সা, এখন দু পয়সার কম কথাই কয় না। তবে লেখে বটে, হ্যাঁ। যত খুশি বলে যাও সব ধরিয়ে দেবে একখানি পোস্টকাডে। একবারটি আমি ভাবনু, ঘোষাল বাড়ির মেজো বউ পাস দিয়েছে, পয়সা দিয়ে লেখাই কেন গোঁসাইকে দিয়ে ? তা বললে তুমি হাসবে পটলবাবু, বলতে শুরু করেছি কি করিনি, মেজো বউ বললে আর তো জায়গা নেই চিন্তামণি ! এত কথা লিখবে তো খামে লিখলে না কেন ?

তা—তা—

কী হল তুমার ?

সত্যি কথাই বটে তো।

কী সত্যি কথা ?

খামে লেখো না কেন ?

একটা পয়সা লোকসান হয়। তাছাড়া, কাগজ কই ? মাগো বাবাগো ! কী ফ্যাঁকড়া বেঁধেছে কাগজ নিয়ে ! না চেয়ে মিলত আগে যত চাও তত, চাইলে পরে খিঁচড়ে ওঠে এখন ! নবীনকে দিয়ে দিস্তে দিস্তে কাগজ হেডমাস্টার বেচে দিত দোকানে। এবার মোটে দু চার দিস্তে বেচলে—পায়নি তো বেচবে কি ! তা দর যা হয়েছে কাগজের, ক দিস্তে বেচে লাভ কিছু কম হয়নি।

আর কিছুর দর বাড়েনি ?

আ কপাল আমার ! থপ করে কপাল থাপড়ে দেয় চিন্তামণি, দর যদি না বাড়বে তবে দেশ-গাঁ ছেড়ে হেথায় আসি ?

পটল ভাবে, কাণ্ড বটে ! রাঁড়ির নাকি ঘরের অভাব, ভাতের অভাব ঘটে !—তা সে একবার হবিষ্যি করুক আর তিন বেলা খাক ? বাবুর বাড়ি কচিকাঁচার পাল, কাপড় যত আছে, ছিঁড়তে লেগেই বনে যায় কাঁথা, এমনি রাঁড়ি ঘরে পুষতে বাবু একদম পাগল। কাঁচা নয় যে খাটতে নারাজ, বুড়ি নয় যে চক্ষুশূল। এদের কত দাম এমনি সব বাবুদের কাছে !

পটল যাবে কলকাতা, তার দাদার ফিরতি বিয়ে। বাবু বললে, ওহে পটল শোনো, ঝি টেঁকে না জানো। বলে, পয়সা পাব বেশি, তোমার কলে খাটাও বাবু ! সবাই যদি কলে খাটবে তো ঝি কে থাকবে ঘরে ? হিসেব বুঝিয়ে দি জলের মতো সাফ—পয়সা পাবি বেশি, এমন খাওয়া পাবি কোথা ? কাঁকড়ে চালের মোটা ভাত দুবেলা খেতে যে বেশি পয়সায় কুলোবে না হারামজাদি ? তা কে শোনে কার কথা। মাসটি গেলে মাইনে নিয়ে ভাগে, অন্য কলে খাটতে যায়।

আজ্ঞে ভালো খাওয়া ভাল্ লাগে না মাগিদের। পয়সা পেলে আধ পেটাতে খুশি।

মন্দ দিনকাল পটল। সবদিক দিয়ে মন্দ। বাপের কালের ধানকল আমার, ইদিকে সেই প্রথম। আজকে দ্যাখো, দেড়গন্ডা কল বসেছে। দু চারটে সাঁওতাল ছাড়া জোয়ান মাগি একটা আসে না কলে ! ভাদুরী ব্যাটার শয়তানি চাল আর সয় না পটল।

দাঁড়ান না, ব্যাটা ডুববে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম তোমায়। দেশের দিকে যাচ্ছ, যদি ঘর গেরস্ত এমন কাউকে পাও, আশ্রয় নেই কষ্ট পাচ্ছে, পারলে এনো দিকি একটা। খাবে পরবে ঘরে থাকবে ঘরের মানুষের মতো, বাচ্চা কটাকে দেখবে আর এটা ওটা করবে। মাইনে পাবে না, ঘরের লোকের মাইনে কি ? নেহাত যদি চায় তো না হয় দুটো টাকা হাতখরচ বাবদ দেওয়া যাবে। বুঝলে না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। খোঁজ করব।

বুড়ি ব্যারামি যেন না হয় বাপু। মাঝ বয়েসি স্বাস্থ্য ভালো এমনি কাউকে এনো।

তা হাওড়ায় তার দেশের গাঁয়ে অমন কাউকে মেলেনি—বয়স আছে, স্বাস্থ্য ভালো ! এমন মেয়েই কম গাঁয়ে। দুটো চারটের বেশি কোনো কালে ছিল না। আজ তারা যেন কোথায় উধাও হয়েছে। উধাও কি হয়েছে ? না রোগাপটকা বনে গাঁয়েই আছে তাই ওই বয়না খাটে না ?

বাড়ির মেয়েদের নিয়ে গেছে কালীঘাটে, সেখানে দেখা চরণ দাসের সাথে।

এ কথা সে কথার পর আপশোশ করে বলে, ইকি ব্যাপার আঁ ? কমবয়সি নয়, মাঝবয়সি নাদুস নুদুস মেয়ে একটা গাঁয়ে নেই ? বাবুর ফরমাশ ছিল।

চরণ বললে, হালে এয়েছে গাঁয়ের মেয়েদের সাথে একটা। জোয়ান মেয়ালোক। চেনা লোকের জানা বাবুর বাড়ি খুঁজছে—

আমার বাবু রাখবে।

তোমার সেথায় ? ও খুঁজছে কলকাতায়।

শুধোও, যদি যায়।

অনেক কথা, অনেক দ্বিধা, অনেক ধাঁধার পর চিন্তামণি রাজি হল। শেষ মুহূর্তে চরণ বললে পটলকে, একটা কথা বলি। দায়ি করবে শেষে ? স্বভাব তেমন ভালো নয় শুনি চিন্তামণির।

পটলের যেন তা জানতে বাকি ছিল ! নয়তো এই বাজারে এত বহর মিহি কোরা থানকে ফেরতা দিয়ে পরে আর কপাল-ঢাকা ঘোমটা টেনে চাবির গোছায় ভারী রিং আঁচলে বেঁধে পিঠে ঝোলায়, যার স্বভাব ভালো ? নানা বর্ণের নানা ধাঁচের সেলানো পাড়ের ঢাকনা তার তোরঙ্গের, শোওয়ার কাঁথা তোশক-সমান পুরু ! ওসব জানে পটল, ওতে যায় আসে না কিছু, ধোপা নাপিত কামারকুমার যারা, সমাজ তাদের এমনি মেয়ের কেলেঙ্কারি সয়, যদি সেটা সত্যমিথ্যা গুজব ছাড়া আর কিছু না হয়।

রাত্রিগুলি অন্ধকার। পাপ যে করে চুপেচাপে তার বিচারের ভার সেই বিচারকর্তার যার সৃষ্টি সেই অন্ধকার। হাওয়ায় ভাসা কথার বেলা সমাজ তাই কানা। পিছে যদি কেউ লাগে আর হাতেনাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, হা দ্যাখো, তখন সমাজ দণ্ড দিয়ে বলে যে আজ থেকে তুমি পতিত হলে, প্রাচিত্তির করে যদি ভোজ দেও সমাজকে তবেই উঠতে পার সমাজে, নইলে নয়।

চিন্তামণিকে সে পৌঁছে দিল বাবুর বাড়ি। তার বাবুর নাম নীলকণ্ঠ ঘোষাল, দুপুরুষে হরের্নাম রাইস মিলের মালিক।

পরদিন বাবু বললে, অ পটল, এ করেছ কী ? ওনা যে বলছে দূর ! দুর ! খেদিয়ে দাও— বিদেয় কর আজকেই ? ওনার চেয়ে সাফসুরুত এ ঝি, চলন যেন রাজকন্যের দাসী। বললে না পিত্যয় যাবে পটল, রোয়াকটুকু পেরিয়ে যেতে সময় লাগে নতুন বোয়ের বেশি। আমি বলি যাহোক নাহোক এসেছে যখন এ্যাদ্দুরে, থেকেই যাক একটা দুটো মাস। তা ওনা বলছে আজ নয়তো, কালকে, ওকে বিদেয় করা চাই। তুমি যদি তোমার বাসায়—

আমার বাসায় ঝি ! পটল প্রায় চোখ উলটে বলে, বাবু, মাইনে কিছু আর চাল কিছু যদি না বাড়ান, আধেক মাস উপোস দিতে হবে।

বাবু চুপ। মুখে বড়োই অসন্তোষ। সব কথাতে এই কথা আনা চাই পটলের আজকাল। একবার নয়, দুবার নয়, দশবার। কলে যখন পুরোদমে কাজ, সবদিকে নজর রাখতে বাবু একদম অপারগ, চাল যেন পটল সরায় না তার বছর খোরাকি আর বছব পোশাকির মতো। কী করে সরায় তাই না শুধু জানা নেই বাবুর !

পটল তখন বলল, এক কাজ করেন বাবু। মার সামনে ধমক ধামক দিয়ে বলেন, মাইনে পাবেনি একটা পয়সা। খাওয়া পরায় থাকবে থাকো, নইলে তুমি ভাগো বাছা। আর মাকে বলেন, মাগির হাতে জল খেতে আপনার ঘেন্না করে, এমন নোংরা মাগি।

বাবু কিছু বলল কি বলল না বাবুই জানে, চিন্তামণি সেই থেকে আছে। তেমন সাফসুরুত আর নয়, ঘোমটা অনেক খাটো, চলন বেশ জোরে।

এতদূর এসে পথের ধারে শিরীষ গাছের তলায় বসে আছে, সাইকেল চড়ে বাড়ি যাবার সময় তাকে দিয়ে চিঠি পড়াবে বলে ! বাবুর বাড়িতে যেন লোক নেই চিঠি পড়বার। বাবুর ছেলে মেয়ে একসাথে ম্যাট্রিক দিয়েছে এবার, ছেলেটা ফেল করেছে খবর এসেছে দিন সাতেক আগে। আহা, পাস করেও মেয়েটার কী কান্না।

নাক সিটকানো স্বভাব বড়ো মেয়েটার পটলবাবু। বলেছিল বটে, চিঠি পড়ে দেব চিন্তামণি ? আমি ভাবলাম, কাজ নেই বাবু চিঠি পড়ে, ঘরের কথা জানাব ! আমায় দাও, পড়তে জানি আমি, বলে তাই নিয়ে নিলাম চিঠিটা। ওগো মাগো কী যে তখন দেমাক দেখালে ছুঁড়ি !

দেমাক নাকি। বললে পটল আর হাতল ধরে খাড়া করলে সাইকেলটাকে।

দেমাক নয় ? আকাশ থেকে পড়ে যেন আশ্চর্যির পার নেইকো এমনই করে বললে, পড়তে জানো তুমি ?

জানো নাকি সত্যি ? উৎসুক পটল শুধোল।

জানি নে তা ঠিক। কিন্তু জানলে অবাক হবার কী আছে শুনি ?

সাইকেল চেপে পটল যখন অনেক দূরে গেছে তখন যেন চিন্তামণির মনটা উঠল কেমন করে। শ্রাবণ শেষের বৃষ্টি ছাড়া বাতাস ছাড়া দিন, ভাদ্র মাসের উজল কড়া রোদে ঘাম ছোটানো গরম। পুজোর আর কটা দিন বা বাকি। এমন দিনে এই বিদেশে সে বিদেশিনি গো ! একেবারে একাকিনী সে !

ক—

লাল কাঁকরের পথটা এখন ধুলোর কাদায় কাদা, হেথায় হোথায় গাড়ির চাকার গর্তে জমা জল। দুপুর বলেই লোক চলাচল কম, নইলে পথে মানুষ কিছু কম চলে না। এদিক ওদিক দূরে কাছে গাঁ চোখে পড়ে ঢের, তবু যেন খেত আর ডাঙায় চারিদিকটা তেপান্তরের মাঠ। ডোবা নালায় খালবিলে ঝোপে-ঝাড়ে বনবাদাড়ে গাছ-আগাছায় ঘেঁষাঘেঁষি চব্বিশ পরগনার গাঁ, খিদিরপাড়ার চারিদিকে। ছায়া যেন আপনি নিবিড়, কচুরিপানার পাঁকাল গন্ধে ভরা। এখানে সব ফাঁকা, আশপাশের গাছগুলিকে যেন গুনে নেওয়া যায়। পথের দুপাশে খানিক দূরে দূরে মানুষ গাছ রেখেছে, তার বেশির ভাগই শাল, শিরীষ আর কদম,—দুদিক পানে দূরে তাকালে তবেই চোখে পড়ে তাদের সারি বাঁধা রূপ।

খেতগুলি আজ ফসলে ঢাকা, ডাঙা মাঠে বড়ো বড়ো তৃণ। ঝাঁকাটি ঝোপের পর্যন্ত সরস নবীন রূপ। কালচে রাঙা কাঁকর মাটির পথটি ছাড়া কদিন আগের এবড়োখেবড়ো রাঙামাটির শুকনো দেশ সবুজ হয়ে গেছে। অনেক দূরে শাল বনের সবুজ সেদিনও ছিল, লাল মাটির ধুলোয় যেদিন এই শিরীষ গাছের পাতা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল লাল।

প্রথম বর্ষণে তখন গাছের পাতার ধুলো ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে। কোনো খেতে লাঙলের মুখে মাটি উঠছে ডেলা ডেলা, মই লাগিয়ে ভাঙতে হবে। কোনো খেতে, হয়তো ঠিক পাশের খেতেই লাঙলের ফলা ডাবছে না মাটিতে। বড়ো বড়ো ফাটল ছিল এ খেতে শোঁ শোঁ করে জল শুষে নিয়েছে, সবটা খেত নরম হয়নি।

গৌরাঙ্গের বড়ো খেতটার একপাশে একটুখানি জমিতে লাঙল চলল, তাইতে কাহিল হয়ে পড়ল বলদ দুটো। লাঙল যেন নোঙর হয়ে ঠেকে যাচ্ছে।

খেটে দি চাঁদকাকা ?

না।

চন্দ্রকান্ত গৌরাঙ্গের আসল কাকা, সম্প্রতি ভাইপোর সঙ্গে ভিন্ন হয়েছে। ভাবে ভাবে ভিন্ন হওয়া, ঝগড়া বিবাদ নালিশ ফরিয়াদ কিছুই ঘটেনি। মাসেক পরে কী কারণে চাঁদের মন বড়োই বিরূপ হয়েছে ভাইপোর পরে। কেন যে তার মন বিগড়েছে অনেক ভেবে গৌরাঙ্গ তার হদিস পায়নি। আকাশ থেকে যেন মনোমালিন্য নেমেছে তাদের মধ্যে। কথা কয় না, খবর নেয় না, গৌরাঙ্গ যদি বা বাড়িতে যায় তো কাকি পর্যন্ত বলে না যে, আয়রে বাপা, বোস।

আরেকটু জল না পেলে খেতে তার কাজ চলবে না। বলদ তার নেই, ফের সেদিন ভাড়া করতে হবে। সারাটা দিন সামনে পড়ে আছে, কারও খেতে আজ খেটে দিলে একটা দিনের হাল বলদ আর খাটুনি তার পাওনা হয়ে থাকত।

জোড়া বলদের বদলিতে কাকা তাকে তিন বিয়োনির গাই দিয়েছে একটা আর একটা মদ্দা বাছুর। ঠকিয়েছে নাকি তাকে তার চাঁদকাকা ? খেটে দিতে বারণ করল কেন ? কাজ ফুরিয়ে গেলেও বলদ জোড়া দেবে না নাকি তাকে ?

কাল তুমার শেষ হবেনি চাঁদকাকা ?

হবে। তাই কী ?

আরেক বর্ষা নামলি মোরে বলদ জোড়া দিয়ো।

মোর কাজ নেই কো ? আদুলির ডাঙা জমিতে হাল দিতি যাব আরেক বর্ষায়।

আদুলির নামা জমি ? কুথা পেলে বটেক তুমি, আঁ ?

কিনতে পারি। পেতে পারি। জুটতি পারে। তোর কাজ কি অত খপর নিয়ে ? তোর বাপের জমি নয়।

আদুলির নামা জমি বিলি হয়েছে সতেরো বিঘা, চড়া সেলামিতে। টাকা থাকলে গৌরাঙ্গও দু-এক বিঘা নিত। কিন্তু কাকা তার টাকা পেল কোথায় ? ক বিঘে জমি সে নিয়েছে ? ভিন্ন হবার এতদিন পরে হঠাৎ আজ গৌরাঙ্গ ঈর্ষার তীব্র জ্বালা অনুভব করে। এই জন্য—শুধু এই জন্য চাঁদকাকা তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে। চাঁদকাকা সম্পত্তি বাড়াবে, বড়োলোক হবে !

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ ভাবছিল, খানিকদূর থেকে ব্যাপার অনুমান করে রঘু সামন্ত হাঁক দিল, খাটবি নাকি গৌর ?

খাটতি পারি।

আয়।

গৌরাঙ্গ খুশি হয়ে জোয়াল থেকে বলদ দুটিকে মুক্তি দিল। লাঙলটা কাঁধে তুলে বলদ তাড়িয়ে খাটতে গেল রঘুর জমিতে।

বীজধানের অভাবে এবার অল্প-বিস্তর সবাই কাতর। অনেক চাষির এ অভাবটা চিরস্থায়ী দায়, কোনো বছর বাদ যায় না। বীজধান তুলে রাখে, আশা করে এবার হয়তো হাত না দিয়েই চালানো যাবে খেটেখুটে পয়সা কামিয়ে ভগবানের দয়ায়। বীজ যে লক্ষ্মী সবাই জানে, একমুঠো ছড়িয়ে দিলে ফিরে আসে দশ মুঠো হয়ে। কিন্তু প্রতি বছর পেটের জ্বালায় শেষ মুঠোটি উজাড় হয়,—যদিও পেট তখনও জ্বলে। খুঁজে পেতে কেঁদেকেটে বীজ জোগাড় হয়, অবিশ্বাস্য চড়া ধানের সুদে। এবার এই স্বাভাবিক অভাব নয়, ফাঁদে পড়া সর্বজনের সর্বজনীন অভাব। চাষিরা সব চিরকালই চাষি, চাষাড়ে জ্ঞান, চাষাড়ে মতিগতি। ধানের দাম এমন চড়ে গেল যে দাদা, বাপ আর নিজে এই তিনপুরুষে তেমন শুধু স্বপন দেখা ছিল। ধানের এমন দাম চড়া মানেই চাষির লক্ষ্মী বাড়া—চাষিরা জানে এ ছাড়া আর অন্য নিয়ম নেই, অন্যথাও নেই। সোজা হিসাব, সোজা নিয়ম, প্যাঁচ থাকবে কোথায় ? তিনের দরে এক মন বেচে তিন টাকা পাই, সাতের দরে এক মন বেচে পাই সাত টাকা। চারটে নগদ টাকা, কড়কড়ে চারটে নতুন ছাপা নোট যে বেশি পাই তাতে কি আর সন্দেহ আছে ভাই ?

হরেনাম রাইস মিলের নীলকণ্ঠবাবু, ভাদুরী রাইস মিলের জলধরবাবু আর মডার্ন রাইস মিলের বিনোদবাবু তিনজনেই দর বাড়ায়, কিন্তু তাদের চেয়ে চড়া দর দেয় অজানা অচেনা বিদেশি ক জন লোক ! মানুষ তারা অচেনা বটে কিন্তু তাদের টাকাগুলি চেনা। ধান নিয়ে তারা পালিয়ে যায় না, গাড়ি বোঝাই দিয়ে রাইস মিলেই ধান নিয়ে ফেলে। খালি মধুবনির তিনটে মিলে নয়, সাত ক্রোশ দূরে গোদাপাড়ার মিলে পর্যন্ত যায়। গোদাপাড়া জায়গা ছোটো, মিলটা কিন্তু মস্ত আর একেবারে রেল লাইনের ধারে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে কল চালাতে শুরু করে তিনটি মিলের তিনটি বাবুই যেন ধান কিনতে উদাস ভাব দেখায়। যেমন তেমন ছাঁটা ধুলো কাঁকর মেশাল দেয়া চালগুলি প্রায় চালান হয়ে এলে, মিলের কাজে কমবেশি ক্ষান্তি পড়ে গেলে, তিনটি বাবুই দর কমিয়ে ধানের দাবি জানায়, পাওনা ধান, ঋণের ধান, ছাঁটাই করে চাল ফিরিয়ে দেবার ধান।

দাদন যারা দিয়েছিল তারা অনেকে চেয়ে চেয়ে পুরোনো দরে ধান পায়নি, টাকার গরম চাষির তখন মগজ ছুঁয়েছে। বলে দিয়েছে, সুদে আসলে টাকা ফেরত নাও, ও দরে আর ধান পাবেনি। কিন্তু দাদন নিয়ে কি চাষি রেহাই পায় ? দাদনদার চেপে ধরে ভয় দেখিয়েছে যে দাদন ঋণ নয়, গচ্ছিত ধান বেচে দেওয়া চুরির শামিল পাপ—ধান না দিলে ফৌজদারিতে একেবারে জেল ! ধান যদি নেই, হিসাব মতো বাজার দরে পাওনা ধানের দামটা দিয়ে দাও !

চাষির হাতে টাকা এসেছে ঢের। যাই বাড়ুক তার খাজনা বাড়েনি সবাই ভাবছে, এতদিনে চাষিই এবার সুখী, খাজনা দেবার খরচটা সে টেরও পাবে না। কিন্তু বাঁধা খাজনার বাঁধন অটুট রেখে জমিদার যে চাষির লাভে ভাগ বসাতে পারে এ হিসাবটা সবার ফসকে গেছে। আইন রেখে আইন ভাঙার পেশায় যিনি মেডেল-যোগ্য গুণী, তিনি যেন প্রজারই ধনলাভে খুশি হয়ে ঘুমোতে পারবেন।

জমিদারও খাজনা চাইলে,—ধান। ভুলানো নয়, ঠকানো নয়, টাকার বদলে ধান ! আগের চেয়ে দাম বেড়েছে ধানের ? বেশ, আগের চেয়ে একেবারে এক টাকা বেশি ধরো। জমিদার যে অবুঝ তাও নয়। ধান যার নেই সে টাকায় খাজনা দিক, কী আর করা যাবে।

ধান যার কম আছে সে টাকায় আর ধানে দিক, কী আর উপায় আছে।

ধান যার আছে তার ভাবনা কি, ধানেই খাজনা শোধ !

ধানের তাই বড়ো অভাব ঘরে ঘরে। বীজধানেরও চমকপ্রদ অভাব।

সদরে বীজধান দেওয়া হচ্ছে। গৌরাঙ্গ, রঘু আর সদয় সামন্ত সদরে গেল বীজধান কিনতে। তিনজনেই চাষা কি না, বীজধান দেখে তাই তিনজনেরই সে কী জবর হাসি !

দম নিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, যে ধান গাছে তক্তা হয়, এতে সেই গাছ হবে।

চাপরাশি কান ধরে তাদের বার করে দিল।

অনেকেরই বীজধান ছিল না, তবু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত আবাদের জন্য তৈরি সমস্ত জমির জন্য যত বীজধান দরকার ছিল জোগাড় হয়ে গেছে। বীজধানের জন্য সামান্য যা কিছু বাঁধা পড়ল, ঋণের বোঝা বেড়ে গেল, যারা কিনল বীজধান—জমির আগামী ফসলের মোটা অংশই মহাজনের কবলগত হয়ে গেল অনেকের। সরকারি কৃষি বিভাগের লোভ, লাভ ও অব্যবস্থার স্তর থেকে মহাজনের ঘর থেকে বীজধান নেমে এল আগামী দুর্দশার বীজ হয়ে চাষিদের ঘরে। অন্য সমস্ত কিছুই যেমন যার যত দরকার তার তত জোটে না—কয়েকজন পায় অনেক, তার চেয়ে বেশি কয়েকজন পায় যথেষ্ট এবং অধিকাংশই পায় কম—প্রাণপাত সংগ্রহ প্রচেষ্টার ফলে চাষিদের বীজধানও ঘরে এল সেই নিয়মে।

বুড়ো হারাণের সাত বিঘে জমি, তার চার বিঘেতে বীজ ছড়ানো চলবে, তিন বিঘে বাঁজা হয়ে থাকবে উর্বরা বিধবা মেয়ের মতো। হারাণ করে কী, তিনুর কাছে গেল। তোমার অনেক বিঘে জমি তিনু, শ বিঘে হোক তাই কামনা করি, লক্ষ্মীমন্ত হও। তুমি দানা পেয়েছ ঢের, ভালো সরকারি দানা। তোমার দীনু ভাইটি তক্‌মাধারি চাপরাশি, আহা, তার ভালো হোক, তোমার ভালো হোক। তুই আমার বাপ তিনু, আমার জন্মদাতা বাপ, গড় করছি তোর দুটি পায়ে, আমায় দানা দে। দাম নে, নগদ নে বেশি নে, কিন্তু দে।

তিনু। নেই।

হারাণ। আছে বাবা, আছে। ভাই তোর চাপরাশি, তোর নেই তো আছে কার ?

তিনু। বাড়তি নেই।

হারাণ। দামও বেশি নে বাবা, দু আনা ফসলও নিস।

তিনু। জমি দাও, তিন আনা তুমি পাবে।

হারাণ। শালা ! চোর ! খচ্চর।

তিনু। ভাগ্ তবে ব্যাটা বুড়ো বাঞ্চোত ভাগ্। মেথি ঘাস বুয়ে দিবি যা, মাগনা পাবি। বোঝায় বোঝায় বেচবি ঘাস।

হারাণ। অ বাবা তিনু, একটু বিবেচনা করো বাবা। দয়া ধম্মো করো বাবা একটু। মোর জমি, মোকে তিন আনা দিবি, ই কি একটা কথা হল রে বাপ ?

তিনু। তিন আনাই তো মাগনা পাবে, মফত্ পাবে। একপাই জুটবে তোমার জমি ফেলে রাখলে ? আচ্ছা যাও বুয়েটুয়ে খেটেখুটে সব করবে, চার আনাই দেব তোমায়।

সময় নেই, উপায় নেই যে আর দশ জায়গায় চেষ্টা করবে। যত চেষ্টা সম্ভব ছিল সব সমাপ্ত হয়ে গেছে। তিনু শুধু মহাজন নয়, চাষি মহাজন, গত সনে তার প্রত্যাশা ছিল না, আগামী সনেও তার প্রত্যাশা নেই যে তিনুর হিসাব, বিবেচনা আর দরদ থাকবে মহাজনের মতো, যতই সেটা হোক নিজেরই স্বার্থের হিসাব আর বিবেচনা, মেকি দরদ। তিনু মহাজন চাষি, তিনু তার শত্রু। স্বার্থের সংঘাতে ভাই যেমন শত্রু হয় ভাইয়ের। তিনু তাই হারাণের জমি পেল আগামী ফসলের চার আনা ভাগের ভাড়ায়। খাজনার দায়িক হল না, ফলাবার শ্রমিক হল না, শুধু হল উর্বরতার মালিক। দাঁও মারার গৌরবে তিনু পুলকিত হয়ে রইল এবং হারাণের তিন বিঘে জমিতে ঘাস গজানোর বদলে ফসল হল !

এমনই অনেক রকমারি জটিলতার ভূমিকা তৈরি হবার পর সব খেতে ফসল ফলেছে। ফলেছে ভালোই। বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে নিবিড় সতেজ তরুণ তৃণে, মোটা মোটা শিষের গোছ এদিক ওদিক দুলছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু মন কেঁপে কেঁপে ওঠে। আতঙ্ক জড়িত ক্লেশের মতো একটা অনুভূতির খোঁচায় সর্বদা মনে হয়, এ ফসলে কারও পেট ভরবে না। এ শুধু ফসল, অন্ন নয়। দাদ চুলকানোর আরাম ভুলে চাষিরা মাথা চুলকায়। ভাববার ও বুঝবার চেষ্টা করে যে এসব কী ব্যাপার। ধারণা করার ক্ষমতা দিয়ে কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না, শুধু গত দিনগুলির অভিজ্ঞতা তাদের ব্যাকুলতা এনে দেয়, অনির্দিষ্ট ভয়ের সাড়া জাগায়। কী একটা প্যাঁচে যেন তারা পড়েছে, কী যেন মুশকিল ঘটবে তাদের, বিপদ আসবে। অভাবের জীবনে অভাব বাড়ে কমে, দুর্ভোগ চড়ে নামে, ও সব খাপছাড়া কিছু নয়। এবার সব উলটোপালটা, গোলমেলে, অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। হাতের মুঠোয় এসে লাভ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লোকসানে। ভালো ফসল ঘরে তুলে বেড়ে যাচ্ছে খিদের যাতনা ভোগ। জমিদার মহাজন উকিল ডাক্তার দোকানি পশারি আত্মীয় পরিজন বন্ধু ও পর নিয়ে যত মানুষের সঙ্গে ছিল তাদের কারবার, ক টা মাসে যেন কেমন হয়ে গেছে তারা সকলে, কথা ও ব্যবহার যেন বদলে গেছে আগাগোড়া, লেনদেনের স্বাভাবিক হৃদয়হীনতা যেন দাঁড়িয়ে গেছে উলঙ্গ কুৎসিত নিষ্ঠুরতায়, লোভের যে অত্যাচার ছিল শুধু আদায়ের জন্য—আদায়ের পরে যেন তা বজায় থাকছে আরও তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়ে।

কে জানে এ সব কীসের সূচনা, কী আছে তাদের ভাগ্যে !

বৈন চিন্তামনি,

তোমার যে পত্রখানা দিয়াছ ইহাতে পরম সুখী হইয়াছি। অদেষ্টে সুখ নাই আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। কে দিবে যে আমার মন্দ অদেষ্ট আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। আমার জমিটুকু ওনার বড়ো ভাই জোর করিয়া গার দাপটে ভোগ দখল করেন তুমি জানিবা এবং কতকাল আমার বলিবার কিছু মুখ নাই কারণ গুরুজন বেটাছেলা তাঁহার অমান্য করিলে লোকে থুথু দিবে। বিন্দীপাড়ার বিপিনকে দিয়া এবার বলাইলাম যে এই দুর্দ্দিনে আমার ভাগ দিবেন আমি এতকাল চাই নাই এখন ভাগ না পাইলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। পেটের খুধায় তুমি মধুবনী গিয়াছ বলিয়া আমার অন্তরে কত দুক্ষ জানিয়া গ্রাহ্য করিল না। সাফ জবাব দিল এমন পাষাণ। আমি কত সাধাসাধি করিলাম দাদা

গিয়া কিছু বলিল না। ১ মাস যাবত আমাশায় ভুগিবার কালে কত সেবা করিয়াছি, গু মূত ঘাটিতে ঘিন্না করি নাই। বর্ত্তমানে অসুখ সারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসাও করে না। বৌ আংটি চাহিয়াছিল আমি দিই নাই তৎকারণে শত্তুর হইয়া আছে তুমি জানিবা, বৌর পরামর্শ দাদাকে বিরাগ করিয়াছে। আংটি বাঁধা দিয়া টাকা লইয়াছি আমি কেমন করিয়া আংটি দিব। বৌর কথায় মার পেটের বৈনকে ভাসাইয়া দিল। দাদা বলিল না আমি কি করিব, বিন্দীপাড়ার বিপিনকে দিয়া ওনার বড় ভাইকে বলাইলাম। বিপিনের ভাইর সঙ্গে হেমীকে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে। ডাকাতের হাতে মেয়ের বিবাহ দিয়া কি অশান্তিতে আছি আমারই অন্তরে জানে। দাদা বলিল না আমি কি করিব। বিপিনকে বলিলাম সে গিয়া বলিল। আমি মেয়ালোক কেমন করিয়া বলিব। জামাই হেমীকে লইয়া কাকীর বাড়ীতে চাঁপাবালাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল। মাত্র ২ দিন ছিল। কাকী পত্র লিখিয়াছে জামাই শাশুরিকে প্রণামি ১ খান কাপড় দিয়াছে তাহা গামছার মত। সোনার গহনা ইত্যাদি চাহিয়া অনেক গোলমাল করিয়া হেমিকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। জোর করিয়া বিবাহ দিয়া চাঁপাবালার শ্বশুড় এইরূপ কার্য্য করিল। কাকী চাঁপাবালা আর হেমীকে রাখিতে পারিবে না বলিয়াছে। শ্বশুড়ের কাছে টাকা চাহিতে গিয়া পায় নাই, দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে এমন শ্বশুড় দেখি নাই। গোঁসাই ঠাকুর বলিতেছেন আর কুলাইবে না অধিক আর কি লিখিব। আমি ডায়মণ্ডহারবার যাইব না, কেমন করিয়া যাইব। নবিন ধানের কাজ করিয়া টাকা পায় নাই। নুনা জলে ধানের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তুমি সর্ব্বদা পত্র লিখিবে। আমার খাওয়া চলে না। তুমি পেটের খুধায়।

দুই

রঘুর অবস্থা এদের মধ্যে একটু ভালো। বছরের বারোটা মাসেরই খোরাক তার জোটে, ছেলেপুলে আর বুড়ো বাপ একটু দুধ পায়, ঘরের চালা ঝাঁজরা হয়ে জল পড়ে না, মাঝে মাঝে সকলে নতুন কাপড় পরে, মেয়েরা চুলে তেল দেয়।

রঘুর দুটি বউ, বিরজা এবং দুর্গা। বিরজা বড়ো বউ, দশ এগারো বছর স্বামীর ঘর করছে। দুর্গা এসেছে তার বছর চারেক পরে। বয়সে বিরজা তার সতিনের চেয়ে বড়ো হবে কিনা সন্দেহ, হয়তো বা ছোটোই হবে দু-এক বছরের। তবে কিনা চাষি গেরস্ত ঘরে অত বছর গুনে বয়সের হিসাব রাখার গরজ কারও নেই, দরকারও হয় না। যে বয়সে বিরজা যতখানি বিয়ের যুগ্যি হয়েছিল তার চেয়ে চার বছর বেশি বয়সেও দুর্গা সে যোগ্যতা পায়নি।

আকারে বিরজা দুর্গার চেয়ে অনেক বড়ো, লম্বায়, চওড়ায়, মাংসের সংস্থানে। ছোটোখাটো বেঁটে আর রোগা প্যাটকা চেহারা দুর্গার। অনেক চেষ্টায় দেড়মাস জিইয়ে রাখবার মতো একটা খুদে ছেলে বিয়োবার পরেও তার বিয়ের সময়কার চেহারা বিশেষ বদলায়নি, শুধু মুখখানা একটু প্যাঙাসে মেরে গেছে, উপোসির মতো। বিরজার ছেলেমেয়ে হয়েছে মোট সাতটি, তার মধ্যে তিনটি বেঁচে নেই। বিরজার এই বাড়াবাড়ির জন্যই দুর্গাকে রঘুর বিয়ে করা, ঘন ঘন দীর্ঘকালের জন্য শূন্য শয্যার ফাঁকা অসম্পূর্ণ জীবন তার সয়নি। নইলে বিরজার জন্যই চিরদিন তার দরদ বেশি। বিরজা তার প্রথম বয়সের সোহাগিনি, তার ছেলেমেয়ের মা, তার সঙ্গে কি অন্য কারও তুলনা হয় ! আজও সেই তার সব, বাড়তি একটা বউ ছাড়া দুর্গা আর কিছুই নয়।

ঈর্ষায় আতঙ্কে বিরজা প্রথমে খেপে গিয়েছিল। তারস্বরে ঘোষণা করেছিল যে সতিনকে মেরে নিজে সে বিষ খেয়ে মরে যাবে, তারপর রঘু যেন আবার বিয়ে করে, দশটা বিশটা বিয়ে করে, বিয়ের

সাধ মেটায়, সে কিছু বলতে আসবে না। দুর্গাকে দেখে, রঘুর মন বুঝে, নিজের যা কিছু ছিল সব বজায় আছে এবং থাকবে জেনে, শেষে বিরজা শান্ত হয়েছিল। তার মনে আর কোনো ক্ষোভ থাকেনি। তাকে ছেড়ে তাকে ভুলে ছেলে তার খেলার পুতুল নিয়ে মেতেছে দেখলে তার যেমন স্নেহার্দ্র প্রশ্রয় জাগে, রঘুর আবার বিয়ে করাকেও সে তেমনই তার জীবন্ত পুতুল নিয়ে খেলা করার ছেলেমানুষি বলে গ্রহণ করেছে। চারিদিক বিবেচনা করে মনে মনে বরং একটু খুশিই হয়েছে বিরজা, স্বস্তি বোধ করেছে। পুরুষ মানুষের আলগা শখের জন্য এই ব্যবস্থাই মন্দের ভালো। স্বভাব বিগড়ে পুরুষ সংসারধর্মে উদাসীন হলে বড়ো বিপদ ঘটে, তার চেয়ে এ অনেক ভালো। আর যাই হোক, ঘরমুখো মানুষ এতে ঘরমুখোই থাকে।

দুর্গাকে বিরজা শাসন করে, কেটে ছেঁটে তার অধিকার খর্ব করে রাখে কিন্তু তেমন কিছু অত্যাচার করে না। রঘুর পক্ষপাতিত্বই দুর্গাকে সতিনের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছে। বিরজা যাই করুক তাকেই রঘু চিরদিন সমর্থন করেছে, কখনও ভুলেও দুর্গার পক্ষ নেয়নি। দুর্গাকে বেশি কষ্ট দেবার তাগিদও বিরজা তাই কখনও অনুভব করেনি।

দুর্গা বিরজার মন জুগিয়ে চলে, তার হুকুমে ওঠে বসে। ভারী ভারী কাজ করা তার শক্তিতে কুলোয় না, ছোটোখাটো খুঁটিনাটি কাজ সে অবিশ্রাম করে যেতে পারে। ছেলেমেয়ে গাইবাছুর নিয়ে যে গেঁয়ো চাষির সংসার সেখানে এ রকম কাজেরও অভাব নেই। বিরজার সেবাও দুর্গা করে, তার চুলের জট ছাড়িয়ে, পিঠের ঘামাচি মেরে, পায়ের হাজায় তেল লাগিয়ে। এতে তার আপশোশ কিছু নেই। মনে নালিশ পুরে রেখে বিরজাকে সে খুশি রাখতে চেষ্টা করে না, সতিনের মন জোগানোর স্বভাবটা তার আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। পায়ের নীচে দাঁড়াবার মাটি কোথায় নরম, কোথায় শক্ত টের পাওয়ার মতো স্পষ্টভাবেই পরাশ্রয়ী মেয়েমানুষ জানতে পারে কোথায় তার আশ্রয়। মানিয়ে চলাটা তাদের মজ্জাগত ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

রঘুর অবাধ্য হতে দুর্গা ভয় পায় না, কসুরও করে না তাকে চাপা গলায় দু-চারটে মন্দ কথা শুনিয়ে দিতে। কিন্তু বিরজার সব কথা সে মেনে চলে। নির্বিচারে মেনে চলে।

এবার এক কাণ্ড করে বসেছে এই দুই সতিনে। দু জনে পোয়াতি হয়েছে প্রায় এক সঙ্গে। খেতে ফসল কাটার কাছাকাছি সময়ে তাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা।

সে পর্যন্ত টিকে থেকে দুর্গা যদি অবশ্য হাঙ্গামাটা সইতে পারে। দুর্গার শরীর বড়ো খারাপ, তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দিতে হয়েছে। সময় আসা পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ জেগেছে সকলের মনে এবং এ বিষয়ে সকলেই প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে যে কোনোরকমে ততদিন বেঁচে থাকলেও প্রসবের ধাক্কাটা সে সামলাতে পারবে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই সে মারা যাবে।

ডাক্তার কবিরাজ এ কথা বলেনি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজেরাই তারা জেনেছে। বাড়ির মানুষ শুধু নয়, গাঁয়ের মেয়েরাও দেখতে এসে সায় দিয়ে গেছে এই আন্দাজে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক যারা মরে ছেলে হবার সময় এমনি অবস্থাই তাদের হয় শরীরের প্রথম থেকে। এমনি যারা বেশ সুস্থ সবল তারাই এ রকম অবস্থা হলে আর বাঁচতে পারে না, দুর্গা তো চিরদিন দুর্বল, ক্ষীণজীবী।

আপদ চুকে যায় তো যাবে, বিরজার মনে হয়েছে এ কথা। এ রকম অনেক কথাই মানুষের মনে হয়, অধিকাংশ সময়েই কিছু তাতে এসে যায় না। তা ছাড়া, ও কথা মনে হওয়ার মানে এই নয় যে আপদ চুকে যাবার প্রক্রিয়াকে বাতিল করার চেষ্টা করতে সাধ জাগবে না। বিরজা নিজেই গরজ করে রঘুকে দিয়ে দুর্গার চিকিৎসার জন্য মথুর ডাক্তারকে আনাল।

মথুর ডাক্তার বলল, ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। নাড়ি একটু দুর্বল, জ্বরের লক্ষণটা ভালো নয়। এ রকম পেট খারাপ থাকলে চলবে না। তা, একরকম ঠিক হয়ে যাবে ও সব।

মথুর ডাক্তারের অভয়বাণী শুনে রঘু হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তারের পরীক্ষার সময় সেও কাছে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দুর্গাকে দেখেছে। তারও জানা ছিল দুর্গা এবার মরতে পারে, আজকেই দুর্গা তার নজরে পড়েছে কয়েকবার, অথচ সে সত্যসত্যই জানত না এমন বিশ্রী হয়ে গেছে তার ছোটো বউটার চেহারা। গলা পর্যন্ত কাঁথা ঢাকা দিয়ে চিত হয়ে দুর্গা বিছানার সঙ্গে মিশে শুয়ে আছে, পেটটা শুধু তার উঁচু। শীর্ণ বিবর্ণ মুখের দুটি কোটরে জ্বরের ধকে জ্বলজ্বল করছে কালো দুটি চোখ। বাড়িতে ডাক্তার এলে এমনি মনটা দমে যায় মানুষের, ভুলে যাওয়া রোগ শোক অজানা বিষাদ হয়ে ঘনিয়ে আসে, সমবেদনায় থমথম করে অনুভূতির জগৎ। দুর্গার দিকে চেয়ে থেকে তার যে কঠিন অসুখ হয়েছে অনুভব করে রঘুর ভেতরে অস্থির অস্থির করছিল। মথুর ডাক্তারের মুখে রোগের আশাপ্রদ আলোচনা শুনে সেটা ভয়ে পরিণত হয়ে গেল।

বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু ?

বাঁচবে না ? কেন, ওর হয়েছে কী ! ছেলেপিলে হবে বলে একটু যা ভাবনার কথা, নইলে অসুখ তো সেরে যাবে দু দাগ ওষুধে।

ওষুধ লিখে দেবার কাগজ বাড়িতে না পাওয়ায় মথুর চটে গেল। রোগের এই মরশুমের সময় চারিদিকে তার অসংখ্য রোগী, তার কি বসে থেকে নষ্ট করাবর মতো সময় আছে !

দাও বাপু, ওই ঠোঙাটা এগিয়ে দাও।

ঠোঙার কাগজেই মথুর ওষুধ লিখে দিল। তার নিজের দোকান থেকেই ওষুধ আসবে। এমনভাবে সে প্রেসক্রিপশনে লেখে যে সে ছাড়া আর কারও পড়বার ক্ষমতা থাকে না। অনেকদিন কম্পাউন্ডারি করে মথুর ছোটোখাটো একটি ওষুধের দোকান খুলে সস্তায় ডাক্তারি আরম্ভ করেছিল, চাষি মজুরদের মধ্যে তার খুব পশার। ফি সে যে শুধু কম নেয় তা নয়, তার সঙ্গে দরদস্তুর করে আরও দু-চার আনা কমানো যায়, পয়সার বদলে ফলমূল, ধান, চাল, দুধ, দই দিয়েও তার পাওনা মেটানো চলে। চাষিরা তাই অত্যন্ত পছন্দ করে তাকে। যাবার সময় মথুর বলে যায়, শুধু বার্লি আর ওই ফুডটা খাওয়াবে বাপু। যেমন বললাম তেমনই করে খাওয়াবে। ফুডটা কোথায় পাবে জানি না আমার কাছে নেই। পাও যদি তো দাম দিতে কান্না আসবে, তাও বলে যাচ্ছি আগে থেকে। কিন্তু ওটা চাই। গায়ে জোর নেই কো একদম, পেটে কিছু সইবে না, ওটা এনে খাওয়াতে হবে। দুধটুধ ভাতটাত আর দিয়ো না কিন্তু, খবরদার !

রঘু নিজের মনে খানিক চিন্তা করে বলে, হ্যাঁ, শালার ডাক্তার ভালো। ঠিক ধরেছে। ছোটো বউ, শুনছ ? যা তা খেয়োনি।

চিঁ চিঁ গলায় দুর্গা বলে, খেতে দেয় নাকি মোকে ? খিদেয় মরে যাই না ?

রঘু বিরজার মুখের দিকে তাকায়।

বিরজা মাথা নেড়ে বলে, চোখের খিদে। কাঞ্চার হয়েছিল মনে নেই ? যেমন খায় ঠিক তেমনই সব বেরোয় আর সারাখন খাইখাই করে মরে ? কতো খাওয়ানু তবু পাঁকাটি হয়ে গেল না অমন ছেল্যা মোর, মরে গেল না ! চোখের খিদে মরণ খিদে। বার্লি তোলা রইতে পারে একটুকু, ফুটিয়ে দিচ্ছি, খাওয়াও না কেনে।

বিরজা যেন রাগ করেই বার্লি ফুটিয়ে আনতে যায়। কিন্তু রঘু জানে এটা তার রাগ নয়। মৃত সন্তানের কথা মনে পড়লেই বিরজার সব কথায় কলহের সুর আসে, দুপ দাপ পা ফেলে সে হাঁটে। দুর্গার কাছে গিয়ে রঘু তার কপালে হাত দিয়ে জ্বর অনুভব করে, হাতের তালু এবং উলটো পিঠ দুদিক দিয়েই জ্বরটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। মথুর ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে বলে গেছে জ্বর কত, কিন্তু রঘুর কাছে স্পর্শ না করে তাপ টের পাওয়ার কোনো অর্থ নেই। একশো তিন বেশি জ্বর তা সে জানে, কেমন ধারা বেশি সেটা তো জানতে হবে গায়ে হাত দিয়ে।

হ্যাঁ, কপালটা পুড়ে যাচ্ছে দুর্গার। গলার নীচে বুকের তাপটাও রঘু পরীক্ষা করে। ডান হাতটি বার করে দুর্গা গায়ের কাঁথার ওপরে ফেলে রেখেছিল, মরা সাপের মতো হাত। মায়া দেখাতে নয়, তাপ দেখবার জন্যেই সে হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে রঘুর যেন ধাঁধা লেগে যায়। নিজের পরিপুষ্ট সবল হাতের মস্ত থাবায় এইটুকু হাত নেতিয়ে আছে দেখে দুর্গাকে তার খানিক আগের চেয়েও অনেক ছোট্ট, অনেক ক্ষীণ মনে হয়। একটু হতভম্ব হয়ে থাকে রঘু, তার গা ঘিনঘিন করে। কিছুদিন আগে চাঁদ মাইতির আট বছরের মেয়েটাকে নিয়ে গাঁয়ের ভূতনাথ সা-র কীর্তির কথাটা মনে পড়তে থাকে। ভূতনাথের জেল হয়েছে সাত বছর। যত সে নিজেকে বোঝায় যে এ তার বিয়ে করা বউ, বয়স এর কম হয়নি, অনেককাল এ তার ঘর করেছে, একবার মা হয়েছে তার ছেলের। ততই যেন শায়িতা দুর্গা ম্যালেরিয়ায় পেটমোটা কঙ্কালসার কচি একটা মেয়ে হয়ে তার আরও বেশি ঘেন্না ধরিয়ে দেয়।

বার্লি করে এনে বিরজা দেখল রঘু বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

স্টেশনের কাছে বাজার, সেখানে সবগুলি দোকান খুঁজে ফুড মিলল না। হাফেজের মনোহারি দোকান আর রামশরণের ডিসপেনসারির সমান কিছু এ অঞ্চলে নেই। ফুডটা দুজনের দোকানেই ছিল, কিন্তু বিক্রি করার গরজ ছিল না মোটেই। এ সব জিনিসের দাম তখন দিন দিন চড়ছে চোরাবাজারে।

এ যে মুশকিল হল গৌর ?

সদরে গেলে হয়।

দুর্গাকে দেখে অবধি গৌরাঙ্গের চোখ দুটি ছলছল করছিল। বয়স তার বেশি হয়নি, যদিও সাধারণ হিসাবে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে অনেকদিন। রঘু সদয় তিনুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যতই কাবু হয়ে পড়ার ভান করুক, বিয়ে করতে পারেনি বলে সংসারের ভাবনাগুলি তার এখনও খুব হালকা। এক মা, এক বিধবা ভাজ আর তিন ভাইবোনের ভার অবশ্য কম নয় তার মতো গরিবের পক্ষে, এই ভারেই সে নির্ঘাত কাবু হয়ে পড়বে কয়েক বছরের মধ্যে, যদি না তার আগেই ওদের মরণ বাঁচন সম্বন্ধে উদাসীন হতে শিখে যায়। গৌরাঙ্গের চেয়েও অনেক বেশি কোমল হৃদয় যুবকের যে উদাসীনতা আসতে দেখা গেছে। বউ আর ছেলে মেয়ের ভালোমন্দ সম্বন্ধেও মানুষের উদাসীনতা আসে, কিন্তু সেটা সাধারণত জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসে ভোঁতা নির্বোধ হয়ে যাবার লক্ষণ। সদয়ের ভাই হৃদয়ের যেমন হয়েছে, জোয়ান মদ্দ মানুষটার বেঁচে থাকতেই যেন গা নেই।

সদরে যাবার আগে পটলের পরামর্শে রঘু নীলকণ্ঠের কাছে গেল। গৌরাঙ্গও তার সঙ্গে গেল। এ বাড়িতে সে কিছুদিন থেকে দুধ জোগান দিচ্ছে, এই সম্পর্কের জোরে ফুড সংগ্রহ সম্পর্কে বাবুর কৃপা দাবি করা হয়তো একটু জোরালো হবে। পটল আগেই শিখিয়ে দিয়েছিল যে শুধু কাঁদাকাটায় ফল হবে না, একেবারে নগদ টাকা সামনে রেখে বাবুকে ধরে পড়তে হবে। দুটি টাকা নীলকণ্ঠের পায়ের কাছে রেখে কাঁদাকাটার বদলে গম্ভীর উদাস কণ্ঠে রঘু তার নিবেদন জানাল। প্যান প্যান করা তার আসে না। গৌরাঙ্গের কথাগুলি বরং শোনাল ঢের বেশি করুণ। ফুডটা যেভাবে হোক বাবু যদি জোগাড় করে না দেন তাহলে রঘুর ব্যারামি বউটা যে মরে যাবে, এইটুকু জানাতে গিয়েই গলাটা ধরে এল তার।

নীলকণ্ঠ বৈঠকখানায় তামাক খেতে খেতে এই সকালবেলাই অর্ধেক চোখ বুজে স্বপ্ন দেখছিল,—টাকার স্বপ্ন। দু জনের কথা শুনে সজাগ ও ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, তোরাও মজেছিস ? বলি বাবা, রোগ ব্যারাম কি আগে ছিল না এ দেশে, না, বোতলভরা ফুড না খেয়ে রোগ সারেনি কারও ? বাপঠাকুরদা তোদের চোখে দেখেছিল না নাম শুনেছিল ফুডের ?

রঘু সাগ্রহে বলল, আমিও তো তাই বলি। ডাক্তারবাবু কিনা ফুড ফুড করে খ্যাপা তাইতে নিরুপায়।

কাল থেকে রঘুর মনে হচ্ছিল ফুডটা নিয়ে সে চরম দায়ে ঠেকেছে। ফুডটা দুর্লভ হওয়ায় তার কেমন ধারণা জন্মে গিয়েছিল, এই বস্তুটি সংগ্রহ করার উপরেই দুর্গার বাঁচন মরণ নির্ভর করছে, ফুড খেলে দুর্গা বাঁচবে, নইলে বাঁচবে না। নীলকণ্ঠের কথায় দায়বোধটা একটু হালকা হওয়ায় সে স্বস্তি পেল।

ডাকিস কেন ডাক্তার ? ও হল বিলিতি চিকিচ্ছে, বিলেতের লোকের জন্যে। যেমন দেশ, যেমন লোক, তেমনই হবে চিকিচ্ছে, এই হল রীতি। আমরা আর সায়েবরা সমান নাকি ? ওরা হল গে ম্লেচ্ছ, বর্বর—দেহসর্বস্ব জাত। একটা লোক প্রেমভক্তির সন্ধান জানে ও দেশে ? একটাও না ! ওদের চিকিচ্ছে এ দেশে খাটবে কেন বাবু ? এ দেশের ডাক্তারি নেই ? আয়ুর্বেদ হয়নি এ দেশে ? কোবরেজ মশায়কে ডাকতে পারলে না ?

আজ্ঞে, ভুল হয়ে গেছে। ফুডের বদলিতে তালি কি খাওয়াই ?

রঘুর এ প্রশ্নের জবাব নীলকণ্ঠ দিতে পারল না। বোতল ভরা ফুডের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ পথ্য আছে ঢের, কিন্তু নীলকণ্ঠ কি মুখস্থ করে বসে আছে তার নামগুলি ? কবিরাজকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে। শুনে রঘু আবার দমে গেল। দায়বোধটা ভারী হয়ে উঠল আবার।

তালি ওই এইগোটা জোগাড় করে দেন বাবু।

আমি কোথা জোগাড় করব ফুড ?

নীলকণ্ঠের মেয়ে সুনীতি ধিনিক ধিনিক নাচের ভঙ্গিতে অকারণেই ঘরে এসেছিল, এবার সে ম্যাট্রিক পাস করেছে। একটা ফুডের অভাবে একজনের বউ মরে যাবে শুনে মনটা কেঁদে উঠেছিল বলে নয়, ভেবে চিন্তে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলেই সে বলে ফেলল, আমাদের তো দুটো আছে, একটা দিয়ে দাও না বাবা ?

মেয়েকে ধমক দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে নীলকণ্ঠ বলল, ওর একটাও দিতে পারব না বাবু, আমি কি দোকান খুলে বসেছি ? বিপদ-আপদের জন্য রেখেছি ও দুটো, কখন দরকার হয়।

আনিয়ে দেবেন বাবু ?

না-না-না। আমি পারব না। নীলকণ্ঠ গর্জন করে উঠল। তার রাগ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রঘু আর গৌরাঙ্গ জানল কেন যে তার বাড়িতেই দুটো ফুড আছে ? এ এক দুর্ঘটনা বইকী ! কপালটাই মন্দ রঘুর। বাড়ির জিনিস না দিক, নীলকণ্ঠ দয়া করে একটা ফুড আনিয়ে দেবার ভারটা নিশ্চয় নিত। কিন্তু রাগ হলে মানুষ কী করে দয়া করে ?

ভোরে গৌরাঙ্গ নীলকণ্ঠের বাড়ি দুধ দিতে যায়, গাছের মাথা থেকে রোদ মাটিতে নামার আগে। গায়ের জ্বালায় পরদিন সে অনেক বেলা করে গেল আর এমন জল মেশাল দুধে যে জিনিসটা দাঁড়িয়ে গেল দুধ মেশানো জল। সময়মতো চা না পেয়ে সকলে খেপে ছিল, হিসাব মতো অভ্যর্থনা পেয়ে গৌরাঙ্গ খুশি হল। তার এই প্রথম ত্রুটিকে সবাই উদার ভাবে ক্ষমা করলে সে বড়োই ক্ষুণ্ণ হত !

এত দেরি করলি যে বজ্জাত ?

দেরি হয়ে গেল বাবু।

এ কি দুধ রে হারামজাদা ?

মোর দুধ ওমনি বাবু।

নিজেকে বেশ নির্দয় ও নির্ভীক মনে হয় গৌরাঙ্গের, যেটুকু রাগ প্রকাশ পাচ্ছে তার চেয়ে বিশগুণ রাগ বাবুদের হয়েছে সন্দেহ নেই। যতটা রাগ চাপা যায় চেপে রেখে শুধু যে বাড়তি অসহ্য রাগটুকুতে বাবু আর তার মাগছেলের চোটপাট, একী আর টের পেতে বাকি আছে গৌরাঙ্গের। তাকে ধরে মারতে না পেরে কী কষ্টই হচ্ছে এনাদের ? দুধের বেশ টানাটানি পড়েছে চারিদিকে। গোয়ালার গোরু কমেছে, গেরস্তের গোরু কমেছে, রোগা গোরু আরও রোগা হয়ে দুধ দিচ্ছে কম। কিছু কম দামে প্রায় খাঁটি দুধ তার কাছে এতদিন পাওয়া গেছে, তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে মুশকিলে পড়বার ভরসা এনাদের নেই। নীলকণ্ঠের বন্ধু উকিল মধুবাবু চুপিচুপি তাকে সেধে গেছে এখানে জোগান বন্ধ করে তাকে দুধ দিতে—দাম সে বেশি দেবে, আগাম দেবে। কিন্তু তখন নীলকণ্ঠকে গৌরাঙ্গ খাতির করত, পোয়াতি একটা মেয়েছেলের প্রাণ বাঁচাতে একটা ফুড না দিয়ে সে তখন তাকে চটায়নি। কাকার সঙ্গে ভিন্ন হয়েই দুধের বদলে নীলকণ্ঠের কাছ থেকে অতি দরকারি ক টা টাকা পেয়ে গৌরাঙ্গ কেনা হয়ে গিয়েছিল। কাল পর্যন্ত সে ধারণাও করতে পারেনি এ কৃতজ্ঞতার তার কারণ নেই, বাবুর দরদ সেরেফ ফাঁকি। অভিভাবকের, ভালো মন্দের দায়িকের ঋণ যেন সে শোধ করেছে কাল পর্যন্ত ভোরে উঠে সবার আগে একটুখানি জল মেশানো দুধ পৌঁছে দিয়ে। হুস করে উপে গেছে সে ভাব তার মনের বিরাগে শুধু নীলকণ্ঠের কালকের অপরাধ নয়, এতদিন ধরে তাকে ঠকানোর অপরাধেরও শোধ নিতে পারছে ভেবে হিংসার সুখে মনপ্রাণ তার তাজা হয়ে ওঠে।

অনেক লম্পটের শোষণে ছিবড়ে বনা বাজারের মেয়েলোকের মতো এ বাড়ির গিন্নির চেহারা, গলায় মোটা চেন হারটি সোনার শিকলের মতো। এতদিন কিছু মনে হয়নি গৌরাঙ্গের ভদ্রমহিলাকে দেখে মৃদু একটা অস্বস্তি বোধ ছাড়া, আজ বারেবারে তার গোরুর কথাটা মনে পড়তে লাগল, যার গলায় হারের মতো একটা কুকুরবাঁধা শিকল জড়ানো আছে আজ তিন বছর।

সবার শেষে গিন্নি থামল। গিন্নি থামা পর্যন্ত ঠায় বসে রইল গৌরাঙ্গ বারান্দার একপাশে উবু হয়ে। শেষের দিকে একবার তার সাধ হল যে বেয়াদবির পালা সাঙ্গ করে নাকে খত দিয়ে আবেগে গদগদ ভাষায় ক্ষমা চেয়ে জানিয়ে দেয় যে এমন আর হবে না কোনোদিন, ফিরে আবার প্রার্থনা জানায় একটা ফুডের জন্য।

কিন্তু সাধ জাগলেও সংকোচের জন্য সেটা গৌরাঙ্গ পেরে ওঠে না। বড়ো স্পষ্ট হয়ে যাবে তার বজ্জাতির মানে। বড়ো খাপছাড়া ঠেকবে পরের বউয়ের জন্য তার এমন ধারা ব্যাকুল হওয়া। হঠাৎ সে যেন দিশে পায়। কেউ যা করে না, মোটেই নিয়ম নয় সংসারে যা করা, সে তো তাই করেছে হাবার মতো খেয়ালের বসে অসংগত কাজ—তার যে সাতপুরুষের কেউ নয় সেই একটা রোগা ক্যাংটা মেয়েলোকের মরণ বাঁচন নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে। টের পেলে লোকে হাসবে। তাকে ভাববে ছেলেমানুষ, ছ্যাবলা। সকলে হাসি তামাশা করবে, টিটকারি দেবে।

গোবর্ধনের ছেলে কালীচরণ ছিল তার স্যাঙাত। বছর চারেক আগে কালীচরণ কলেরায় মরে যেতে পৃথিবী শূন্য দেখে শোকে একটু বাড়াবাড়ি রকম কাতর হওয়ার ফলাফলটা গৌরাঙ্গের মনে পড়ে যায়। শুধু তাকে ভাগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বড়োদের পরামর্শে তাকে ধরে বেঁধে জোর করে মাথা ন্যাড়া করে জল ঢালা হয়েছিল কলসি কলসি, মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল মনসা পাতার রস !

ও বেলা ভালো দুধ দেব দিদিমণি।

সুনীতি পালিশ করা চকচকে আওয়াজে বললে, আদ্দেক দুধ আর আদ্দেক জল তো। তোমার নামটি কেন গৌরাঙ্গ ? ফরসা ছিলে বুঝি ছেলেবেলা ?

তামাশায় গৌরাঙ্গের প্রাণে আঘাত লাগে। জীবন তার কাছে ভয়ানক ভারী আর গভীর, একটুখানি কুঁড়ে ঘরে বুড়ি মা, কচি বোন আর গাই বাছুরটি নিয়ে সমারোহহীন যে জীবনটুকু সে যাপন করে বিয়ে করে গাদাখানেক ছেলেপুলে না হলে এ ভাবটা তার কাটবে না, বোধশক্তি ভোঁতা হবে না।

খিড়কি দিয়ে গৌরাঙ্গ এ বাড়িতে আনাগোনা করে। মেঠো রাস্তায় তার পথ সংক্ষেপ হয় না, কিন্তু মেঠো রাস্তায় চলে তার আরাম হয়। তার ভারী আশ্চর্য লাগে যে মানুষের পায়ে পায়ে এমন সরু সুন্দর নির্দিষ্ট পথ কী করে গড়ে ওঠে। কে সকলকে বলে দেয় কোন আধ হাত পরিসরের মধ্যে পা ফেলতে হবে ? খেলার মাঠের বুক চিরে নতুন পথের রেখা সৃষ্টি হতে দেখেও সে বুঝতে পারেনি কী করে কী হল। প্রথমে শুধু কয়েকটি অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন এখানে ওখানে ছড়ানো, পায়ের চাপে শুয়ে পড়া ঘাস, তারপর মরা ঘাসের বিবর্ণতার অনির্দিষ্ট রেখা ও ধীরে ধীরে সেই রেখার উদলা মাটির পথে পরিণতি। আরও কি অদ্ভুত ব্যাপার, আবর্জনার পাশ কাটাতে গোড়ার দিকে পথটি যেখানে একটু বেঁকেছিল, আবর্জনা নিশ্চিহ্ন হবার পরেও পথের সে বাঁক থেকে গেল—কেউ চেষ্টা করল না সে বাঁকাকে সোজা করতে। মানুষের এ সব একার্থকতার প্রমাণ বড়োই দুর্বোধ্য আর রহস্যময় মনে হয় গৌরাঙ্গের। গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কথা বেছে বেছে গান রচনা করে সে তার এই অনুভূতিকে রূপ দেবার চেষ্টা করে।

বাঁকা পথে ছাতিমপাড়া যাতি হবে গো
উদাস নাগরে পথ দেখাবে কে।
মানুষ চলা পথে যাবার নাগর কি গো সে॥
আহা হৈ ..... !
অলো সই !

নীলকণ্ঠের বাড়ির খিড়কির দরজার পরেই একটা পড়ো চালা, তার ওপাশ থেকে হাঁটা পথ গেছে দুদিকে। এদিকে মাঠ পেরিয়ে পুকুর ঘুরে বড়ো রাস্তার ধারে সেই শিরীষ গাছের কাছে, যার তলে দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তামণি পটলকে সাইকেল থেকে নামিয়ে তার চিঠি পড়ায়। আর পুবদিকে পথ গেছে ছোটো জঙ্গল ভেদ করে তাঁতিপাড়ার গা ঘেঁষে গৌরাঙ্গের বাড়ির দিকে।

. চালার পিছনে চিন্তামণি দাঁড়িয়েছিল। আঁচলের আড়াল থেকে একটা ফুড বার করে সে গৌরাঙ্গের গামছায় জড়িয়ে বেঁধে দিল, ভর্ৎসনা করে বলল, তোমার কাণ্ডখানা কী, দুধ মাপতে বেলা কাবার হল ? এটা খাইয়ো তাকে, সেই যার ব্যারাম। কাল যে জন্যে বাবুর কাছে এইছিলে গো তোমরা, কী জ্বালা !

কোথা পেলে ?

বাবুর ঘর থেকে সরিয়েছি, কোথা আবার পাব ? জানাজানি হয়নি যেন বাবা, দূর করে খেদিয়ে দেবে মোকে। বউটা কেমন আছে ?

বাঁচে কি না বাঁচে।

আপশোশের একটা আওয়াজ করে চিন্তামণি মুখখানা করুণ করতে চায়। গৌরাঙ্গের মনে পাক খেতে থাকে জিজ্ঞাসা যে চিন্তামণির কাজের মানে কী।

চিন্তামণির মনে দরদ আছে নিশ্চয়। আজানা অচেনা পরের বউয়ের জন্য নইলে কে সাধ করে চুরি করতে যায় ? অথচ মুখ দেখে আর গায়ে পড়ে কথা বলতে শুনে মনে হয় সে যেন ভারী চালাক মেয়েমানুষ, প্যাঁচ আছে তার মধ্যে।

তাকে আরেকটু চিনবার ইচ্ছায় গৌর শুধোয়, তুমার ঘর কুথা গো ?

শুনে চিন্তামণি মুচকে হাসে। —ওটা পৌঁছে দাও গে যাও। আলাপ কোরোখন পরে যখন সময় পাবে।

বলেই দমক মেরে পিছন ফিরে সে হাঁটতে শুরু করে দেয় তাড়াতাড়ি ছোটো ছোটো পা ফেলে হাঁটার ভঙ্গিতে। অনেকদিন থেকে সে জানে এমনি করে হাঁটার সময় কোমরের নীচে দেহের গাঁথুনি তার মানুষের নজর টেনে নেয়। কোনোদিন তার কোমর দুলিয়ে হাঁটা দেখার কপাল যদি নাই হয়ে

থাকে এ ছোঁড়ার, আজকে দেখুক। বাবুর মেয়ে নাচে,—কী ছাই সে নাচ ! সাপের মতো হাত দুলিয়ে এপাশ ওপাশ করে হাঁটু পেতে বসে আর উঠে দাঁড়িয়ে যদি নাচ হত ওই রোগা প্যাঁটকা শরীর নিয়ে, মানুষ তবে কাঠিকে শাড়ি পরিয়ে খুশিমতো নাচাত, মেয়েমানুষ চাইত না। মেয়ে নাকি আবার প্রাইজ পেয়েছে নাচ দেখিয়ে ! গৌর যদি কোনোদিন দেখে থাকে তার দেশের ওই মেয়ের নাচ, আজ বিদেশিনি তার শুধু চলনটা দেখুক। বুঝুক, ভগবান যাকে দ্যান তার চলার মধ্যেও কত পরান আকুল করা নাচ। খানিক গিয়ে চিন্তমণি মুখ ফিরিয়ে তাকায় তার ঈষৎ হাসির চটুল ভাষা নিয়ে আর গৌরাঙ্গের মুখে সে রকম জবাবি হাসির বদলে সরল সহজ বিহ্বলতা দেখে একটু অবাক হয়ে বাড়ি ঢোকে। মানুষ যে কাঁচা থাকে, নিজে যে সে একদিন কাঁচা ছিল, কতকাল মনে পড়েনি চিন্তামণির ! নীলকণ্ঠ আর পটলের বয়স পেতে অনেক দেরি গৌরাঙ্গের, আজ তক হয়তো সে কোনো মেয়েছেলের গলা পর্যন্ত জড়িয়ে ধরেনি একটিবারের জন্য। মৃদু একটা ব্যাকুলতা মনে আসে চিন্তামণির, বিয়ের আগে গৌরের বয়সি সেই যে একজন তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছিল মৃদু বেদনার সঙ্গে তার কথা মনে পড়ে এতকাল পরে। আর সেই সঙ্গে সস্তা মনে হয় নিজেকে, ফাঁকা মনে হয়, ফুরিয়ে যাওয়া চিকন গুড়ের চ্যাটালো হাঁড়ির মতো।

সেদিন বিকালে দুর্গা মারা গেল। আকাশ ফুঁড়ে ফুডটা পাওয়া গেল, বার চারেক ক্ষীরের মতো ঘন করে অনেকখানি ফুড খাইয়ে দেওয়া হল, তবু যে সে বাঁচল না তাতে কারও সন্দেহ রইল না স্বয়ং ভগবান তাকে মেরেছেন। খবর শুনে গৌর ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে দেখল, ফুডটা জোগাড় করে ছোটোবউকে যে খাওয়ানো হয়েছে এই সান্ত্বনায় রঘু নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে।

ডাক্তর যা বলেছে সব করিছি। করিনি ? অ গৌর, করিনি ? এই বলে কপালটা দু বার চাপড়ে দিয়ে পাঁচুর হাত থেকে কলকেটা নিয়ে তিনবাব সাঁসাঁ শব্দে জোরে জোরে টেনে সে কাশতে থাকে। দু দিন ধরে দুর্গার জন্য তার দুর্ভাবনার বাড়াবাড়িতে গৌরের বড়ো ভয় হয়েছিল। বউটার ভালোমন্দ কিছু হলে রঘু সে আঘাত সহজে সামলাতে পারবে না, হয়তো ভেঙ্গে পড়বে অনেকদিনের জন্য, যতদিন না ভগবান শোকটা সইয়ে দেন। ভাবতেও কত যে আলোড়ন উঠে মনটা মোচড় খেয়েছে গৌরের ! মানুষের মন যে কী অবাক জিনিস ভেবে সে প্রায় রোমাঞ্চ অনুভব করেছে অনেকবার। মনের তলে ছোটোবউয়ের জন্য, দুর্গার জন্য, রঘু যে এমন পাগল এতগুলি বছর রঘুর সঙ্গে মিশেও কে তা ভাবতে পেরেছিল ? রঘুর সুখদুঃখ চিরদিন তার মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে বলেই না গৌরের বুকেও সহানুভূতির বান ডেকেছিল দুর্গার জন্য। অথচ কী সহজ আর স্বাভাবিক শোক হয়েছে দ্যাখো রঘুর ! তার গত দু দিনের উদ্ভট ব্যবহার বাদ দিলে যেমনটি হওয়া উচিত ছিল ঠিক তেমনি।

শোকে উন্মত্ত-প্রায় রঘুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে শোকার্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয় এসে সাধারণ চলনসই দুঃখবোধ করতে গৌর খানিকক্ষণ নারাজ হয়ে থাকে। গোরুটা পর্যন্ত দুয়ে রেখে আসেনি ভেবে তার একটু রাগও হয়। ছেলেমানুষি করে করেই সে ঠকেছে চিরকাল। দুধটা চট করে বাবুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আর দেখা হলে চিন্তামণিকে দুর্গার মরণের খবরটা জানিয়ে এখানে এসে অনায়াসেই সে আটকা পড়তে পারত। কী এসে যেত আধঘণ্টা দেরিতে, দুর্গা যখন মরেই গেছে আর রঘু যখন দিশাহারা হয়ে যায়নি সেই মরণে।

ঘরে কাঁপা কাঁপা সুরে মেয়েরা গান করে যায় মড়াকান্নার, পাড়ার আত্মীয়বন্ধু বাঁশ কেটে আনে মাচা বাঁধার জন্য। রঘু এদিক গিয়ে ওদিক গিয়ে ধীর শান্তভাবে ছটফট করে বেড়ায়, কখনও একটু দাঁড়ায় অথবা উবু হয়ে বসে, খানিক শূন্যে তাকিয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে আর দু-এক মুহূর্তের জন্য চামড়া কুঁচকে কাঁচকে মুখখানা তার বিকৃত হয়ে যায়। দুটো কলকে অনেকের হাতে হাতে ঘুরছে। রঘু মাঝে মাঝে তামাক টানে আর কাশে। সাঁসাঁ করে বেকায়দায় টানে বলেই কাশে, নইলে এমন কড়া তামাক ভূভারতে নেই যে রঘুকে কাশাবে, চিটায় মিঠা দা-কাটা তামাকের তো কথাই নেই।

ধর, গৌর।

গলাটা ভারী রঘুর। ভিজে ঢাকের মতো ভারী !

এইসব মিলেমিশে কখন যে গৌরের হৃদয়ে যথোচিত বেদনা এনে দেয় ! সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলে তার হৃদয়ের সেই বেদনাবোধে কী সব কারণে কয়েকবার খিচ ধরে ধরে তার কান্না পায়। দুঃখ তার বৈরাগ্য হয়ে দু চোখ দিয়ে গলে গলে পড়তে থাকে টস টস করে। জীবন যৌবন ঘরদুয়ার গোরুবাছুর খেতের ফসল সব মিছে, এ জগতে কেউ কারও নয়। বউ কীসের, মেয়েমানুষ কী ? সব মায়া, সব ফাঁকি !

দুধ লিতে এইছে দাদা।

গৌরের কচি বোন আন্না তাকে ডাকতে এসেছে। খানিক মূঢ়ের মতো বসে থেকে গৌর নীরবে উঠে দাঁড়াল।

যাসনি গৌর। অ গৌর, যাসনি মাইরি।

এখুনি এসবোখন—এক দণ্ডে।

রঘুর সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে গৌর বেরিয়ে যায়। রঘুর জন্য তার আর চিন্তা ছিল না। ওর কিছু হবে না।

দুধ নিতে এসেছিল চিন্তামণি। তাকে দেখে গৌরের একবার মনেও হল না যে নীলকণ্ঠের চাকর বাকর কুলি মজুর থাকতে চিন্তামণি কেন দুধ নিতে এসেছে। মনটা তার এতখানি বিগড়ে গিয়েছিল।

ছেলেকে দেখেই গৌরের মা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, বার করেছে ? নিয়ে গেছে ?

গৌর বলল, না।

রঘুর বাড়ি গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে হাহুতাশ করার জন্য গৌরের মা উতলা হয়ে ছিল, ছেলের জবাবটা শোনামাত্র সে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

ফের যাস তো ঘরে কুলুপ দিয়ে যাস।

ঘরে একটা কুলুপ আছে, তাতে চাবি ঘোরে না। কুলুপ দেবার উপায় থাকলে গৌরের মা কি আর এতক্ষণ ঘর আগলে বসে থাকে।

চিন্তামণির সাবান-কাচা সাদা কাপড় একাদশীর চাঁদের আলোর রং ফিরিয়ে দিয়েছে গৌরের একরত্তি উঠোনে। তার পায়ের কাছে পেঁপে গাছের ছায়ার ডগাটাকেও ঝাঁকড়া-চুলো দৈত্যের মাথা বলে কল্পনা করা যায়। মানুষ-মরা সন্ধ্যার আলো ছায়া দিয়ে পৌরাণিক রহস্য চারিদিকে ঘনিয়ে আনা পুরাণ-ঘেঁষা কল্পনারই কাজ।

বউ বুঝি হোথা ?

বউ ? কার বউ ?

ওমা ! বউ নেই ? আঁচলের তল থেকে হাত বার করে গালে দিয়ে চিন্তামণি অবাক হয়ে যায়। —পালাই বাবা তবে।

দুধ লিয়ে যাও।

গৌরাঙ্গ বিরক্ত হয়েছে বুঝে চিন্তামণির একটু রাগ হয়। এতটা বাড়াবাড়ি তার ভালো লাগে না। প্রথমে সে ভেবেছিল রঘুর বউ গৌরের বোন টোন কেউ হবে, তারপর পটলের কাছে শুনেছে সে ওর কেউ নয়। ওর জন্য মানুষ কি মরতে পাবে না সংসারে ? গাঁয়ের কেউ মরলেই যদি এমনি ধারা করতে হয়, টেকাই যে ভার হবে মানুষের।

দুধের পাত্র হাতে নিয়ে চিন্তামণি নালিশের সুরে বলল, একলাটি কী করে যাব ভাবছি।

কী করে এলে ?

এখন এইছি ? সন্দে না লাগতে এসে ঠায় বসে রইছি তোমার জন্যে।

বাছুর ছেড়ে দিয়ে গৌর চিন্তামণির অনেকখানি তফাত দিয়ে গিয়ে দাওয়ায় উঠল। সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাধ জাগলেও কেমন যেন সাহস হল না। চিন্তামণি একটু পিছিয়ে গেলে সে মরমে মরে যাবে। তার ফাঁকা বাড়ির উঠোনে তাকে সামনে দাঁড়াতে দেখে চিন্তামণি পিছিয়ে গেলে তার যে লজ্জা আর অপমান হবে তার বড়ো লজ্জা আর অপমান জীবনে যেন তার জোটেনি, জুটবে বলেও মনে হল না।

সড়ক ধরে যাওগে না, যদি ইদিক পানে ডর লাগে ? রাত আর হয়েছে কত, সড়কে লোক চলছে, সাথি পাবেখন।

ডর তো সেখানে গো, কেমন সাথি জুটবে তা কি জানি ? তোমাদের দেশের মানুষ কেমন তোমরাই জানো ভালো, আমি হলাম ভিন দেশের লোক।

একাই ফিরবে ভেবেছিল চিন্তামণি, আগে ভয় তার ছিল কম। ভয়ের কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে এতক্ষণে ভয়টা তার সত্যই বেড়ে গেল। এদিকে মেঠো পথের নির্জনতা আর ওদিকে বাঁধা সড়কের বিদেশি অজানা পুরুষের কথা ভেবে গা তার ছমছম করতে লাগল। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে এল দাওয়ার কাছে। মিনতি জানিয়ে বলল যে গৌর তাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক ! ঘরে কুলুপ না দিলে কিছু হবে না, কতক্ষণ আর লাগবে তাকে এগিয়ে দিয়ে গৌরের ফিরে আসতে ? এসেই বোকামি করেছে চিন্তামণি—ঘাট সে মানছে গৌরের কাছে।

শোনো বলি কেন এলাম।

বিদেশ বিভুঁয়ে একা পড়ে গিয়ে কী যে কষ্ট চিন্তামণির ! এসে থেকে সে সমান একটা মানুষ পায়নি, চাষি গেরস্থ ঘরের মানুষ, এক ধাঁচের মানুষ, যে মন খুলে দুটো কথা কয়ে বাঁচবে। বাবুর বাড়ি মানুষ আছে ঢের কিন্তু সবাই তারা ভিন্ন জাতের, আলাপ করে সুখ নেই। ঝি আর মজুর মাগিদের সঙ্গে কি তার বনে, সে ছিল চিরটা কাল ঘরের মেয়ে, ঘরের বউ আর ঘরের রাঁড়ি ? ওই যে কথায় বলে জলের মাছের ডাঙায় ওঠা, সেই দশা হয়েছে চিন্তামণির। তাই না সে এসেছিল দুধ নেবার ছুতোয় গৌরাঙ্গের মা বোন মাগের সঙ্গে দু দণ্ড কথা কইতে।

পৌঁছে দেবে না মোকে ?

দেব না বলিছি ?

মেঠো পথে সাপের ভয়। চিন্তামণিকে সঙ্গে নিয়ে গৌর সড়কের দিকে এগিয়ে গেল। অপরিচয়ের ব্যবধান তাদের তখন ঘুচে গেছে। বাবুর বাড়ির দাসী বলে চিন্তামণিকে একটু পর মনে হয়েছিল গৌরাঙ্গের, কী ভাবে তাকে নিতে হবে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। ওরা কোন জাতের মেয়েমানুষ আর কেমন ওদের হালচাল তা কে জানে ! নইলে চিন্তামণির সঙ্গে কথা কইতে কি গৌরাঙ্গের ভাবতে হত, না কোন ব্যবহার উচিত হবে ঠাহর করতে তার ফাঁপর লাগত এতক্ষণ ? চাষির মেয়ের মন না জানুক, মনের গড়ন চাষি জানে। মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে বুলিও চাষিদের এক—কথার ও ভাষার মানের গণ্ডি সম। এইটুকু পথ যেতে যেতে তাই দু জনের ব্যগ্রতাহীন অনায়াস কথোপকথনে অনেক কথার আদান-প্রদান হয়ে গেল—পরস্পরের নানা বৃত্তান্ত। হরের্নাম রাইস মিলের সামনে যখন তারা পৌঁছাল, চিন্তামণি তার চোখের কথা বলছে। গত বছর চোখের অসুখ হয়েছিল বলে কটকট করায় ভাবনা হয়েছে চিন্তামণির।

চোখে কম দ্যাখো ?

না গো, কম কেন দেখব ? দুকুরবেলা চোখটা কেমন টাটায়। যা ধুলো বাবা তোমাদের দেশে !

আজ সকালেও তার দেশ সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধ মন্তব্য গৌরের পছন্দ হত না, হয়তো কলহের সুরে পালটা জবাব দিয়ে বলত যে তোমার দেশে ধুলো নেই ? এখন কথাটায় সায় দিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে বলল, পদ্মমধু দিয়ো দিকিন চোখে একটু। ও বড়ো ভালো ওষুধ।

সেখান থেকে মেঠো পথেই গৌর সোজা রঘুর বাড়ি গিয়ে হাজির হল। মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে হইচই করে দুর্গাকে পোড়াতে গেল বালিময় শুকনো নদীর বুকে। কানাই বংশী আর হরিধনের জন্য একটা দেশি মদের বোতল রঘুকে কিনতে হয়েছিল, গৌরও একটু চেখে দেখল। ভালো করে গেঁজে ওঠেনি এ রকম অল্প নেশালো তাড়ি সে দু-এক ঢোঁক খেয়েছে মাঝে মধ্যে. মদ কোনোদিন ছোঁয়নি।

খেদিরপাড়া
২৪ পরগণা
৪ঠা ফাগুণ

বৈন চিন্তামণি তোমায় কি লিখিব আমার লিখিবার মুখ নাই। আমি কেন জীবন্ত আছি আমার মরণ হয় না ভগমানকে দিবারাত্র জানাইতেছি। কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তুমি কাঁদাকাটা করিবা বলিয়া জানাইতে বিলম্ব করিলাম। ইহার পর আব বাঁচিবার সাধ নাই কিন্তু পোড়া কপালে মরণ নাই আমি কেন মরিব একচক্ষু ভগবান আমাকে কেন লইবে। চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিয়াছে জানিবা। ইহার সব বিত্তান্ত ভাবিলে আমার মাথা ঘুরায় আমি দিবারাত্র মরণ কামনা করি। কাকী থাকিতে দিবে না বলিয়াছে লিখিয়াছিল ইহাতে কেমন করিয়া জানিব কাকী চাঁপাবালাকে মেয়া শুদ্ধ খেদাইয়া দিয়াছে যে তাগো খাওয়া জুটে না হৈমী এবং তাহার মাকে কেমন করিয়া রাখিবে। ইহা কথার কথা ভাবিয়াছি তাই টাকা পাঠাই নাই। আমি কেমন করিয়া জানিব টাকাই বা কোথায় পাইব। গলায় দড়ি দিবে জানাইলে চুরি ডাকাতি করিয়া পাঠাইতাম কিন্তু হতভাগী ইহা জানাইল না। নবিন টাকা পাঠায় নাই। তাহার দোষ কি নূনা জলে ধানের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে কাজ করিয়া টাকা পায় নাই এবং তাহার কি দুর্দ্দশা সে কলে কুলির কাজ করিতে গিয়াছে। চাঁপাবালা কয়দিন খাইতে পায় নাই হৈমীকে লইয়া কোথায় পড়িয়া থাকিয়াছে এজন্য আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছে। গজেন মুক্তারের বাড়িতে উঠিয়া গলায় দড়ি দিয়াছে তাহা হৈমীর জন্য। গজেন মুক্তারের মুহুরির সঙ্গে হৈমী কোথায় চলিয়া গিয়াছে এই কলঙ্কে বুক ফাটিয়া চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিয়াছে। সব গজেন মুক্তারের কারসাজি বলিয়া শুনিতেছি জানিবা। বিন্দীপাড়ার বিপিন হৈমীর জামায়ের বড় ভাই সে গিয়া শুনিয়া আসিয়া বলিয়াছে। সব লোকে আমার মুখে থু থু দিতেছে আমি কেন জীবন্ত আছি। গজেন মুক্তার টাকার কুমীর হইয়া এমন কাজ করিল। মুহুরিকে দিয়া হৈমীকে পলাইয়া লইয়া গেল। গজেন মুক্তার থানায় গিয়া মুহুরির নামে থানা পুলিশ করিয়াছে। বিপিন বলিল ইহা তাহার কারসাজি বজ্জাতি করিয়া করিয়াছে যে লোকে বলিবে যে নির্দ্দুষী। মুহুরিকে তুমি চিনবা সে চাঁপাবালার পিসাতো ভাসুরের ছেলে শরৎ। চাঁপাবালা শ্বশুরবাড়ী থাকিবার কালে হৈমীর ছোটোকালে আসিয়া হৈমীকে কত আদর করিত। কাকী তাড়াইয়া দিলে সেই নাকি চাঁপাকে গজেন মুক্তারের বাড়ী ঠাঁই দিয়াছিল। শরৎ এমন ভালোমানুষ আর অল্পবয়সে তাহার কেন এমন সাহস হইবে। আমি এই হুঁশে আছি আমার মরণ নাই। চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিল হৈমী কলঙ্ক করিল আমি কি করিব। শুধু বুক চাপড়াইয়া মরিব। আমার খাওয়া জোটে না। কয়টা টাকা পাঠাইতে লিখিলাম তুমি পাঠাইলে না। কয়মাস বেতন পাইয়াছ তথাপি ইহা কিরূপ। তোমাকে কতকাল খাওয়াইয়াছি ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি মধুবনী গিয়া সুখে আছ আমি না খাইয়া মরিব। পত্রপাঠ কয়টা টাকা পাঠাইবা।

"দিদি"

তিন

চোখ মেলে চাইলেই শরৎকালের শোভা নজরে পড়ে, সে শোভার রং ভারী সবুজ। লাল ধুলোর কথা তুলে গৌরের এ দেশকে নিন্দে করার ছুতো চিন্তামণির বর্ষায় ভেসে গিয়েছিল, এখন যদি বা এখানে ওখানে শুকনো কাদার ডেলা গুঁড়িয়ে ধুলো উড়ছে দু-এক ঝলক, সেটা কিছু নয়। কুয়াশার দিনগুলি পেরিয়ে গিয়ে আবার ভালো করে ধুলো উড়তে শুরু হবে, ফাগুনের দখিনায় হবে তার ওড়নের চরম বড়াই।

মাঠের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর থেকে অলস অকর্মণ্য জীবন যাপন করতে করতে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছে। ধান কাটার সময় এল এই যা ভরসা। শিষের প্রৌঢ়তা প্রাপ্তির দিন থেকে সবাই নজর পেতে আছে ধানে রং ধরবে কবে। খাটুনি আসবে কঠিন, ঝরঝর ঘাম ঝরবে, গায়ে হাতে ব্যথা হবে, কোমর বাঁকা হয়ে যাবে তাদের বয়স যাদের একটু বেশি হয়েছে। কাজে সুখ নেই, বড়ো কষ্ট কাজে। নতুন আলু, সোনালি আখ, শাকসবজি, বুট মটর সব কিছু কাটা তোলা ধোয়া চাঁছা বয়ে নেওয়া জোগান দেওয়ার কাজে। কাজ শুরু করার খানিক পরেই মনে হবে কী যেন নেই শরীরে—একটুখানি ছিল কিন্তু ফুরিয়ে গেছে। তারপর থেকে বাকি দিনের কাজ শুধু সহ্য করার ধৈর্য দিয়ে, বাঁধা গতিতে বাঁধা নিয়মে কলের মতো। গৌর যে এমন ব্রহ্মচারী যুবক, খেটে যাতে সুখ মেলে তা তারও যেন শরীর মনে মোটে ছটাকখানেক আছে। অকেজো দিনগুলির চাপে কাতর হয়ে পড়ে বলেই তারা কাজের কষ্ট চায়। বছরে কতকাল যে চাষির বেকার কাটাতে হয় !

সবাই নয়। নিজের ও ছেলেমেয়ে মা বোনের সরু হাড় আর অলম্ব মাংসপেশি কোনোমতে যারা টিকিয়ে রাখতে পারে তারা অন্য কাজ খোঁজে না। মজুর হতে খাঁটি চাষি মরমে মরে যায়। ভূমিহীন চাষি পর্যন্ত। পরের জমিতে মজুরগিরিই সে করে, তবু চাষ আবাদ ছাড়া আর কিছু করে না সে চাষি।

সদয়, পচা, ছোলেমান, মৈনুদ্দিন কয়েক টুকরো জমি চষে বটে কিন্তু তাঁতও বোনে বলে তারা তাঁতি। আকবর, যদু, নাসের, সুখলাল ফসল বোনা আর ফসল তোলার সময় ছাড়া বাড়ি থাকে না, কয়লা তুলতে যায় ঝরিয়ার খনিতে, ওরা তাই কুলি। গাঁওতলিতে ঘরের লাগাও সাত কাঠা জমি আছে জগুর, তাতে জগু বরাবর লাঙল দিয়ে ফসল ফলিয়ে আসছে নিজে, কিন্তু মুচিকে কে চাষি বলবে সে জন্য, সরোজ বাঁড়ুজ্যে মুদিখানা খুলেও যখন মুদি নন।

সরোজ বাঁড়ুজ্যের দোকানের সামনে রাস্তার ধারে জগু জুতো সেলাই করতে বসে, প্রায় আপিস টাইম থেকে সন্ধ্যাতক। থানা আদালত জেলখানার ফাঁকা আর সাফসুরত এলাকা থেকে মধুবনির অভিজাততম পথটি আভিজাত্য হারাতে হারাতে গোটা কয়েক মোড় ঘুরে এইখানে বাঁক নিয়ে বাজারের ঘিঞ্জি অঞ্চলে ঢুকেছে, নোংরা আর সংকীর্ণ হয়ে। বাঁকেরই আন্তরিক কোণটার ওপর বাঁড়ুজ্যের মুদিখানা—দোকানও বড়ো, বিক্রিও খুব। জগুর রোজগারও মন্দ হয় না, মাসে অন্তত পাঁচ সাতদিন শ টাকা পুরে যায়। গড়পরতা তিনদিনে একদিন জগু দু-নম্বর দেশি গিলে বাড়ি ফেরে—সন্ধ্যা পার করে রওনা হয়। অন্যদিন দিনের আলো খানিকটা বজায় থাকতেই উঠে পড়ে। বড়ো পথটা ধরেই তাকে আসা যাওয়া করতে হয়—থানা আদালত আর জেলখানার সরকারি পাড়া পেরিয়ে। জেলটা তার চেনা, ভেতরে দু দফায় কিছুকাল বাস করেছে।

বাজার আর আদালতের মাঝে পথের দু ধারে বাড়িগুলি বেশির ভাগ ভাঙাচোরা ইট বার করা সেকেলে ধাঁচের পুরোনো অথবা বদরঙা সেকেলে ধাঁচের নতুন। কয়েকটি বাড়ির চেহারা শুধু খানিক আধুনিক। সকালে ও বিকালে এ সব বাড়ির কোনো কোনোটা থেকে ডাক আসে :

এই মুচি ! মুচি !

সকালে আসবার সময় জগু ডাক শোনে, দরে বনলে জুতো সারায়। বিকালে হাজার গলা ফাটানো ডাক শুনে সে ফিরেও তাকায় না।

মরা খিদেয় আর শ্রান্তিতে মন তখন তার উদাস হয়ে আছে।

পূজা উপলক্ষে পটল এক জোড়া জুতো কিনেছিল। দু দিন পায়ে দিতেই জুতোর একটা পেরেক ডান পায়ে বিঁধতে লাগল। জুতোটা হাতে নিয়ে সে দ্যাখে, খানিকটা সোল কী করে যেন কোথায় খসে পড়ে গেছে। সস্তায় জুতো কেনার প্রায়শ্চিত্ত যে দু দিনের মধ্যে শুরু হয় পটলের সে অভিজ্ঞতা ছিল না। জুতোটা সারাতে দিয়ে বাঁড়ুজ্যের দোকানের ময়লা বেঞ্চে বসে খানিকক্ষণ সে একটানা সেই জুয়াচোরদের গাল দিতে লাগল, মানুষকে যারা নতুন বলে পুরোনো খারাপ জুতো দিয়ে ঠকায়। তার সমালোচনার মোট কথার মানে হল, ওরা ছাড়া পৃথিবীতে আর বুঝি জুয়াচোর নেই।

জগু তার কামানো চিবুক নামিয়ে ঝাঁটার মতো আছাঁটা মোটা গোঁফের নীচে হাসি ফোটায়, উল্‌ল্‌ ল্‌....। বলে, ফরমাশ দিয়ে জুতো বানান, সাতটি বছর ছুঁতে হবে না জুতো।

তুই বানাবি ?

লয় কেনে? বানাইনি কো ফরমাশি জুতো ? ঠাকুরমশায় জানে—কুকুরে যদি না লিয়ে যেত—

দু আড়াই বছরের কথা, জুতোর শোকটা সরোজ বাঁড়ুজ্যের কেটে গেছে, মুখে তাই তার কথাটা স্মরণ করে হাসি ফুটতে পায়। শক্ত লোহার মতো একজোড়া জুতো তাকে জগু বানিয়ে দিয়েছিল, কয়েক মিনিট পরবার পরেই বাঁড়ুজ্যের পায়ে আর ফোসকা পড়ার স্থান থাকেনি। জুতো জোড়া খুলে রাখা হয়েছিল চৌকির নীচে। প্রথম দিনটা পরিষ্কার বোঝা যায়নি, পরের দিন টের পাওয়া গিয়েছিল যে ঘরে বেশ একটু গন্ধ হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়তে তিন-চারদিনে ঘর ম ম করতে লাগল সেই জুতোর গন্ধে। বাইরে বার করে রাখা মাত্র রাস্তার এক নেড়ে কুত্তা এসে একপাটি মুখে করে পালিয়ে গেল।

যদি না নিয়ে যেত—

কাঁচা ছাগলের চামড়া দিয়ে ব্যাটা জুতো বানিয়েছিল। না যায় পায়ে দেওয়া, না যায় গন্ধের চোটে ঘরে টেকা। মুচির কাছে জুতো কিনো না, খবরদার !

জগু নিজেই কথাটায় সায় দিয়ে বলল, মুই মুচি লই। জাত মুচি লই।

পটল বলল, ছাগলের চামড়া ? গোবুর চামড়া বলুন।

বাঁড়ুজ্যে বলল, গোবুর চামড়া ? খেপেছ ! গোবুর চামড়ার জুতো পরব আমি !

চামড়ার মধ্যেও সে যেন টের পায় কোনটা গোবু কোনটা ছাগল ! সবার বুদ্ধি ভোঁতা তাই রক্ষা, নইলে হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করে বসত : গোবুর চামড়া আর ছাগলের চামড়ার জুতোর তফাত জানবেন কী করে ?

এমনি সময় গৌর আর রহিমকে আসতে দেখা গেল কোর্টের দিক থেকে। গৌরের হাতে একটি দলিল।

গৌরের মুখে বজ্জাতি মুচকি হাসি। দেখলেই সন্দেহ হয় কোনো একটা দাঁও মেরেছে। গরিব চাষিমজুরের মুখে এই দাঁওমারা হাসি ভাষার চেয়ে প্রাঞ্জল। দেখেই কাঁচ্চা খানেক এক ঝলক বাড়তি রক্ত পটলের বুকে উঠে গিয়েছিল। চিন্তামণির জন্য তার মাথা ব্যথা নেই। তবু চিন্তামণি তো মেয়েমানুষ আর বেদখলি মাল ! গৌরের সঙ্গে কিছুদিন থেকে চেনা হয়েছে চিন্তামণির। গৌর কি তবে চিন্তামণির—?

আদুলির ভাঙা জমি পেলাম খানিক পটোলবাবু।

কিনলি নাকি ?

পটল যে বেঞ্চে বসেছিল পটলের সম্মান বজায় থাকে এতখানি তফাতে সেই বেঞ্চেই জাঁকিয়ে বসে গৌর বলল, কিনতি যাব কেনে ? ভাগ পেলাম। চাঁদকাকা কিনেছে জমি, আমি ভাগ পেলাম—ফসল সুদ্ধু। কাকা দাপড়াবে, কাটা ছাগলের মতো দাপড়াবে।

রহিমকে সে খাতির করে বিড়ি এগিয়ে দেয়। জিভ দিয়ে গোড়ার দাঁতের ফাঁক থেকে শাকের কণা খসিয়ে এনে উত্তেজনায় সামনের দাঁত দিয়ে কুট কুট কাটতে থাকে। রহিমের কাছ থেকে তার চাঁদকাকা আদুলির ভাঙা জমি কিনেছে,—তারা ভিন্ন হবার আগে। গৌর তা জানত না। এবার মাঠে প্রথম লাঙল দেবার সময়ে খবরটা শুনে মনটা তার গিয়েছিল বিগড়ে, জমি জায়গা কিনবে বলে চাঁদকাকা তবে তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে, তাকে ঠকিয়েছে ! তলে তলে সংসার থেকে সরিয়ে টাকা জমিয়েছে কাকা তাকে ভিন্ন করে দিয়ে নিজে একদিন এইসব করবে বলে ! পরশু তক কাঁটাটা খচখচ করেছে গৌরের মনে। পরশু আদুলিতে রহিমের সঙ্গে তার দেখা। নেহাত বিপাকে পড়ে রহিম তার জমিটুকু বেচে দিয়েছিল, আজ সেই জমিভরা জমকালো ফসল দেখে তার মনটা আঁকুপাঁকু করছে, গাটা জ্বালা করছে, চোখে জল আসছে। তার হাতে কোনোবার তো এমন ফসল হয়নি। বেইমান মাটি !

রহিম। বিশ রুপিয়ায় দু আনা ফসল দিবে না ? না দিলে। খোদা আছেন। না—দিলে !

গৌর। আমায় বলছ ?

রহিম। শরম নাই, আঁ ? জমিটা দিয়ে দিলাম তোমাদের আধা দামে, পয়লা বছরের দু আনা ফসল। বিশ রুপিয়ায় দিবে না ! বহুত আচ্ছা। দেখে লিব।

আদুলিতে চাঁদকাকা কার জমি কিনেছে কিছুই গৌরের জানা ছিল না। রহিমের সঙ্গে খানিক আলাপ করেই জানা গেল কাকাটা তার কত বড়ো ঠক ! ভিন্ন হবার আগে জমি কিনেছে তার কাকা তাকে ভাগ দেয়নি !

চাঁদকাকার নামে গৌর তাই নালিশ ঠুকে দিয়েছে। নিজের ভাগটা পেলেই সে রহিমকে মাগনা দু আনা ফসল দেবে।

সরোজ বাঁড়ুজ্যের হাসির শব্দে গৌর চমকে গেল। বাঁড়ুজ্যে হাসে খুব কম, যখন হাসে হাসিটা তার বাজির বোমার মতো দমাস করে ফেটে চিনা পটকার মতো পটাস পটাস ফেটে চলে। দেহের অনুপাতে গলার নালিটা তার একটু সরু।

গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল !

আজ্ঞে না মুক্তারবাবু বললে—

বাঁড়ুজ্যের হঠাৎ ফাটা হাসি আচমকাই থেমে যায়। ধমকের সুরে সে বলল, মোক্তারবাবুরা অমন বলে ! আরে মুখ্যু, তোর কাকির নামে যদি জমি কিনে থাকে ? যদি বলে ভিন্ন হবার পর কিনেছে ? যদি বলে সম্পত্তি সব তার, তোকে শুধু মানুষ করেছে খাইয়ে পরিয়ে ?

মুখখানা শুকনো করে গৌর দলিলের নকল দেখায়—তাকে ভিন্ন করার প্রায় আড়াই মাস আগে চাঁদকাকা নিজের নামে জমি কিনেছে। রহিম আদালতে হলপ করে বলবে যে জমি কেনার সময় গৌর আর চাঁদ একবাড়িতে একান্নে ছিল। গৌরের বাপ এ বাড়িতে বাস করেছে স্বর্গে যাওয়া পর্যন্ত, চাঁদ কী করে বলবে যে দয়া করে আশ্রয় দিয়ে তাকে মানুষ করেছে ? নাঃ, কোনো দিকে ফাঁক নেই। সনৎ মোক্তার তাকে সব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে।

এবার পটলের সঙ্গে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে বাঁড়ুজ্যে মুচকে হাসল। রহিমের ঠোঁটের কোণেও যেন হাসি দেখা গেল একটু।

তোমার কাকা কী বলে গৌর ? পটল জিজ্ঞেস করল।

কাকার কাছে যাইনি। গৌর দুবার ঢোক গিলল, যেমন ঠকিয়েছে আমায় তেমনি জব্দ হোক।

ও, ঝাল ঝাড়ছে ? পটল বলল। এতক্ষণে ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়েছে।

জব্দ তুমিও হবে। বরং বেশি করে হবে। চাঁদার সঙ্গে লড়তে পারবে তুমি ? তার চেয়ে আপসে ভাগটা আদায় করে নিতে পারলে কাকা তোমার জব্দ হত গৌর।

বাঁড়ুজ্যে এক খদ্দেরের জন্য আড়াই সের চিনি ওজন করতে করতে বলল।

আমিও তাই বলছিলাম বাবু। ও মোটে কান দিলে না। —রহিম সাগ্রহে সায় দিল।

একেবারে নালিশ ঠুকে কাকাকে শাস্তি দেবার কথা সনৎ মোক্তারের পাল্লায় পড়ার আগে গৌরও ভাবেনি। উত্তেজিত উল্লসিত অভিভূত করে সনৎ মোক্তার কী যেন করে দিল তাকে, কী যেন করিয়ে নিল তাকে দিয়ে ! এখানে এই পাকা লোক দুটির ঠান্ডা সাহচর্যে জুড়িয়ে গিয়ে ক্রমেই মনটা দমে যাচ্ছে, একটু বোকা মনে হচ্ছে নিজেকে। সনৎ মোক্তারের হাতে গিয়ে যে কী করে পড়ল তাও সে এখন ঠিকমত ঠাহর করে উঠতে পারছে না। তার জন্যই যেন ওত পেতে অপেক্ষা করছিল সনৎ মোক্তার, ছোঁ মেরে তাকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল চোখের পলকে। খানিক আগে পর্যন্ত তার মনে হয়েছিল ওর মতো ক্ষমতাবান দরদি ও শুভার্থী যেন জগতে আর নেই, এই একটি লোকের হাতে সব ভার, সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুমোতে পারে !

নালিশ করার আগে রঘুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করার কথা বা মাকে একবার জানাবার কথা পর্যন্ত তার মনে পড়তে দিল না সনৎ মোক্তার!

বাঁড়ুজ্যে বলল, ফসল চাঁদা কাকে বেচে দিয়েছে জানিস ? নীলকণ্ঠবাবুকে বেচে দিয়েছে, তোদের ওই হরের্নাম নীলকণ্ঠবাবুকে।

ভয়ের জেদি সাহসে গৌর বলল, বেচে দিক না। টাকার ভাগ দেবে। সাহসটা আরও বেশি প্রকট করে দেখাতে চেয়ে রহিমকে বলল, দুআনার দামটা তোমায় দেব, তুমি ভেবো না।

আর দু জন খদ্দের এসেছে সওদা নিতে—ছেঁড়া ময়লা শাড়ি পরা শীর্ণ রুক্ষ একটি বৃদ্ধা আর পথে কুড়ানো তালি দেওয়া হাফপ্যান্ট পরা সাত আট বছরের একটি ছেলে। বাঁড়ুজ্যে এদের সওদা দেয় না, বাম প্রান্তে নিচু কাঠের বাক্সে বসে এদের কম কম জিনিস দেয় বদ্যি। বদ্যির চারিপাশে মুদিখানার সব জিনিসই সাজানো আছে, তবে ছোটো ছোটো পাত্রে, কম পরিমাণে। বাঁড়ুজ্যের এই আড়তের মতো বড়ো মুদি দোকানের কোণে ওখানে যেন আরেকটি ছোটোখাটো ভিন্ন দোকান করা হয়েছে। বদ্যির বাটখারাটিও ছোটো—অনেকের অধিকাংশ সওদা দিতে সেটা ব্যবহারও হয় না। এক পয়সা আধপয়সার জিনিস কি কেউ ওজন করে বেচে !

বুড়ি বলে, এক ছিদাম নুন, এক ছিদাম ধনে, আধপয়সা—

বদ্যি বলে, ছিদাম নেই গো ! আধপয়সার কম নেই।

কমাস আগেও ছিদামে বেচা ছিল। মোট এক পয়সা পুরলেই হত। কেবল বাঁড়ুজ্যের দোকানে নয়, অনেক দোকানেই। দুপক্ষেরই এতে লাভ। শাকপাতা, শুঁকা বা মেছোবাজার কসাইখানার কুড়োনো পটকা হাড় কাঁটা, নাড়িভুঁড়ি কান যাকে রাঁধতে হবে দু পয়সার তেল মশলায়, সে একটু একটু সব জিনিস কিনতে পারে। ছিদামের জিনিস বেচে দাম ওঠে দু সেরের। রমেশবাবু একবার এক ছিদামের নুন আর তিন ছিদামের চিনি কিনে কিনে পয়সা পুরিয়ে সওদা করিয়েছিলেন মোট চার আনার—এক আনার নুন আর তিন আনার চিনি। তারপর একসঙ্গে পয়সা দিয়ে ওজন করে কিনিয়েছিলেন এক আনার নুন আর তিন আনার চিনি। ষোলোবারে কেনা সমান পয়সার নুন একবারে কেনা নুনের হল অর্ধেক, চিনি তারও কম। ডগসন মাঠের এক সভায় রমেশবাবু তার এই অর্থনৈতিক পরীক্ষার কথাটা এমনভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে গৌরের ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। তারপর ভেবে চিন্তে সে দেখেছে, এক আধপয়সার জিনিস কিনলে দোকানি ঠকায়, তার এবং সকলের এই জানা কথাটাই রমেশবাবু একটু অন্যভাবে জটিল করে বলেছেন।

ছিদামের কারবার এখন আধপয়সায় উঠেছে। কারণ সবচেয়ে কম দামি জিনিসও ছিদামে যতটুকু দেওয়া হত, তার চেয়েও কম জিনিস কোনো কিছুর বিনিময়েও মানুষ মানুষকে দিতে পারে না।

বুড়ি বলল, তবে আদলার নুন আর আদলার হলুদ দাও।

আরেক পয়সার ?

আর নয়।

পয়সা আছে ?

বুড়ি একটা আনি বাড়িয়ে দিল। বাকি তিন পয়সা তার কীসের বরাদ্দ কে জানে !

বদ্যি মাথা নাড়ল।—দু পয়সার কম সওদা নেই।

এতক্ষণে বুড়ি গেল চটে।—নেই তো নেই। ভারী দুকান দিয়েছে।

বুড়ি চলে যায় কিন্তু আধপয়সা একপয়সা করে আনা দুআনার খদ্দের ক্রমে বাড়তে থাকে। বদ্যি ক্ষিপ্রহস্তে একটু মশলা, এক চামচ নুন, আধপলা তেল, কিছু চাল কিছু ডাল ইত্যাদি বেচতে থাকে। এত তাড়াতাড়ি এত জনকে এত জিনিস এত বিভিন্ন দামে সে বিক্রি করে কিন্তু পয়সার হিসেবের জন্য তাকে ভাবতে হয় না, হিসাবে ভুলও হয় না একটা আধলার।

দেখে, চাঁদকাকাকে জব্দ করতে সনৎ মোক্তারকে, আদালত আর আদালতের লোককে দিতে যা খরচ করেছে তার জন্য বড়োই আপশোশ জাগে গৌরের। আত্মপ্রসাদের সঙ্গে জাগে—সে গরিব চাষি, কিন্তু এদের মতো গরিব নয়। এরা সব বাড়তি ফেলনা মানুষ। চাষাও নয়, কুলিও নয়।

দুধ দিতে গৌরকে আর নীলকণ্ঠের বাড়ি যেতে হয় না। দাম বাড়িয়ে দুবেলা সামনে দুইয়ে দুধ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ধর্ম সাক্ষী রেখে সকলেই নির্জলা খাঁটি দুধ কষ্ট করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, কিন্তু অপরপক্ষ কষ্ট করে এসে সামনে দুইয়ে দুধ নিতে চাইলে দর একটু বাড়াতে হয়। ধর্মের দুধের চেয়ে সামনে দোয়া দুধ বোধ হয় খাঁটি হয় বেশি।

কাজটা আয়ত্ত করেছে চিন্তামণি। ভোর যখন শুধু আবছা আঁধার তখন সে পাত্র হাতে ঘুমন্ত পুরী থেকে বেরিয়ে যায়, গৌরের সজাগ বাড়িতে পৌঁছায় আবছা আলোর ভোরে। বিকালে একটু বেলা থাকতেই আসে, সঙ্গে আনে গিন্নিমার কোলের ছেলেটাকে। ঠেলাগাড়ি চেপে বেড়াবার বয়স হয়েছে ছেলেটার।

ভোরে গৌর বাড়ি থাকে। বিকালে কোনোদিন থাকে, কোনোদিন থাকে না। ভোরে দুধ নিয়ে ফিরতে হয় তাড়াতাড়ি, বাবুদের চা হবে। বিকালে সময় থাকে, পাড়ার এ বাড়ি ও বাড়ি একটু বেড়ায় চিন্তামণি। বিকালের দুধটা তার সামনে দোয়া হয় কদাচিৎ।

তাতে অবশ্য আসে যায় না কিছু। দুধে জল একটু তার সামনেই মেশানো হয়। সে সাগ্রহে অনুমতি দিয়েছে।

গৌরের মা খ্যানখ্যান করত, একপো কমিয়েছে টাকায়, একপো ! পোষায় বাছা দুধ জুগিয়ে এ আক্রার বাজারে ?

গৌর সায় দেয়।—ভালো মানুষ পেয়েছে কিনা, সবাই মোকে ঠকায়।

একদিন দুদিন চিন্তা করে চিন্তামণির মাথায় বুদ্ধি খেলেছে।

জল মেশাও না কেন ? যাতে পোষায় এমনি করে জল মিশিয়ে দাও !

তুমি গিয়ে লাগাবে না ?

ইস্, সাতপুরুষের কুটুম কিনা ওনারা, লাগাতে যাব ! মেশাও তুমি জল।

তার আপনপনার ঘটা দেখে গৌরের মা কুরিয়ে কুরিয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। ছেলে তার পুরুষ তো বটে, বিয়ে যদ্দিন না করেছে মেয়েলোক একটা ঘাঁটে তো ঘাঁটুক, সস্তা আর বাজে

মেয়েলোক। কিন্তু পিরিত জানা সোহাগ-বেতর পুরুষচাটা এ মাগির খপ্পরে পড়লে ছেলে তো তার বিগড়ে যাবে !

দুধ নিতে এসে চিন্তামণি বেড়াতে গেছে রঘুর বাড়ি, কাকার নামে নালিশ করার বিগড়ানো মন নিয়ে নিজের বাড়ি না ঢুকে গৌরও এল রঘুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। বাবুর ছেলেকে চিন্তামণি কোলে নিয়েছে, রঘুর মেয়ে তার ছোটো ভাইবোন দুটিকে ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে মহোল্লাসে উঠানময় হাওয়া খাইয়ে বেড়াচ্ছে।

চিন্তামণির কাঁখে বাবুর ছেলে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে, তার খেয়ালও নেই। তার নিজের চোখে জল, ধরা গলায় সে বিরজাকে তার দুঃখের কাহিনি শোনাচ্ছে। রঘু বসেছে একটু তফাতে, তাকেও শোনাচ্ছে। দুঃখের কাহিনি কোনো জাতের কোনো মেয়ে কোনোদিন বলে শেষ করে উঠতে পারেনি। গৌর এসে পড়ায় চিন্তামণিকে থামতে হল, আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে হল।

গৌর তাকিয়ে থাকে। চিন্তামণির দরদ আছে তার জানা ছিল কিন্তু সে যে কাঁদতে পারে আজ এই মাত্র যেন তার সে বিশ্বাস জন্মাল একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে।

কাঁদছ কেন গো ?

কপালে আছে কাঁদছি।

এ জবাবে রহস্যের মুখ ঝামটা আছে, সেটা বেমানান হওয়ায় গৌর অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কাল পর্যন্ত চিন্তামণি তাকে তার সমস্ত দুঃখের কথাই বলেছে। এর মধ্যে এমন কী ঘটল তার কপালে যে বলতে গিয়ে তাকে কাঁদতে হচ্ছে ?

সব তো জানো, আর জিগ্‌গেস করছ কী ?

তখন গৌর বুঝতে পারে যে নতুন কিছু হয়নি, তাকে যে সব কাহিনি বলবার সময় সে শুধু অদৃষ্টকে শেপেছিল আর ভগবানকে বলেছিল মুখপোড়া, বিরজা মেয়েমানুষ বলে আজ তাকে সেই সব কাহিনি বলার সময় সে আজ কেঁদেছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে গৌর রঘুকে বলল। তোমার কাছে এলাম রঘুদা। একটা কাণ্ড করেছি।

বটে ? রঘু বলল।

ওমা, সি কি ! বলল চিন্তামণি।

গৌর তার নালিশ করার কথা বলে, মেয়েরা উৎসুক হয়ে কাছে সরে আসে। বাবুর ছেলের কান্না থামাতে একটু আদর করেই চিন্তামণি বিরক্ত হয়ে তাকে একটা চড় বসিয়ে দেয়। তাতে কান্না আরও বেড়ে গেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনো উপায় না দেখে সে করে কি, কাপড়ের তলে খোকার মাথাটা ঢুকিয়ে স্তনের বোঁটা তার মুখে গুঁজে দেয়। বিরজা মুচকে একটু হাসে।

রঘু যেন আনমনে শুনে যায়, না করে কোনো আওয়াজ, না দেখায় কোনোরকম ঔৎসুক্য। একটু কেমন ঝিমিয়ে গেছে রঘু আজকাল, কেমন একটু নিরাসক্ত ভাব দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। চলতি কিছুর গতি একটু কম হওয়ার মতো জীবন্ত থাকার হাজার হাজার রকমসকমগুলি আগের চেয়ে একটু শ্লথ হয়েছে—একটুখানি। দুর্গার শোক এখনও তার থাকা সম্ভব নয়, নেইও। শোক কারও চব্বিশ ঘণ্টা থাকে না। একটা মানুষ আছে আছে হঠাৎ একটু ডুকরে কাঁদল নয় বুক চাপড়ে হায় হায় করল নয় মুখে মেঘ নামিয়ে আনল—সেটা হল শোক। বরাবর সে এমনি হলে লোকে জানত যে লোকটাই এমনি। কিন্তু দুর্গার মারা যাবার পর সে বদলেছে বলে সময় সময় মানুষ সেটা টের পাচ্ছে।

সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে গৌর বলে যায়, এদিকে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে আকাশে। সন্ধ্যার আগে বাবুর ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে মুশকিল হবে চিন্তামণির, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না শুনে সে উঠেই বা যায় কী করে ? উশখুশ করতে করতে সে একসময় উঠে দাঁড়ায়।

শোনো, তোমায় বলতে ভুলে গিইছি। বাবু তোমায় ডেকেছেন।

সকালে যাব।

উঁহুঁ, আজকেই যেও। এখ্খুনি নয়, খানিক পরেই যেও কথাটথা বলে। যেও কিন্তু, হ্যাঁ। ভারী দরকার—বাবু বললেন, চিন্তামণি, গৌরকে সন্দের পর আসতে বোলো, ভারী দরকার।

চিন্তামণি চলে যাবার পর তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে গৌর রঘুকে প্রশ্ন করল, কী করি বল দিকি এবার ?

কী করবে ? তাইতো বটে। মুশকিল হল।

ভেবে চিন্তে পরামর্শ একটা রঘু দিল, গৌরের সেটা পছন্দ হল না। মামলা যখন ঠুকেই দিয়েছে তখন মামলা চলুক, একী একটা পরামর্শ হল ! মামলা করার, সাক্ষী দেওয়ার অভ্যাস রঘুর, সে কি বুঝবে প্রথম উত্তেজনা কেটে যাবার পর ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো এখন কি হচ্ছে গৌরের মধ্যে !

কিন্তু না, দুর্গা রঘুকে কাবু করে বোকা বানিয়ে দেয়নি।

আপস ? তুই বোকা গৌর ! মামলা হলে কি আপস হয় না ? আগে আপসের চেষ্টা যখন করিসনি, এখন চুপ করে থাক। সমন পেলে চাঁদ মাইতি নিজে আসবে নয়তো তোকে ডেকে পাঠাবে। তখন আপসের কথা হবে।

বিরজা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, ওকে তুমি কি শেখাবে ? সাঁতরাদের ও সাতঘাটের জল খাইয়েছে।

প্রশংসায় খুশি হওয়ায় রঘুর মুখে হাসি ফুটল। হাত বাড়িয়ে বিরজার বুক থেকে সে মেয়েটাকে টেনে নিল নিজের কোলে। মেয়েটা মাই টানছিল বিরজার, মুখ থেকে মাইটা ছেড়ে যাবার সময় একটা শব্দ হল অদ্ভুত, যুবকযুবতির সাবেগ ও স্বাধীন চুম্বনের মতো।

গৌর বিদায় নিচ্ছে, রঘু শুধোল, ফসল বেচে দিয়েছে তোর কাকা ? ব্যাপার ঠিক ঠাহর পাচ্ছি না রঘু। অনেকে বেচছে। কত লোক দর দিচ্ছে, বেচার জন্য ফুসলাচ্ছে, সবুর সইছে না। মাঠের মাল বেচাকেনা হয়, এত তাগিদ কীসের এবার ?

ঠিক। আমিও তাই ভাবছি। মিল কটার তাগিদ বেশি—আর ওই ভুবন সা আর বাঁড়ুজ্যের। বেচবে নাকি ?

নাঃ। ধরে রাখছি।

হরেনাম রাইস মিলের পুবের প্রাচীর ঘেঁষে বড়ো রাস্তা থেকে নীলকণ্ঠের বাড়ির সদর পর্যন্ত কাঁকরের সড়ক। আধখানা চাঁদের মৃদু আলোয় এই সড়ক ধরে গৌর চলেছে, প্রাচীরের গায়ে বসানো ছোটো দুয়ারটির ও পাশ থেকে চিন্তামণি চাপা গলায় ডাকল, এই ! এই ! গৌর ? এই !

গৌর ভাবছিল তার সঙ্গে নীলকণ্ঠের হঠাৎ কী জরুরি দরকার পড়ল, ডাক শুনে সে চমকে উঠে ভড়কে গেল একেবারে। আরও ভড়কে গেল চিন্তামণি যখন দুয়ারটা ভেতর থেকে বন্ধ করে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল মিল অঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের নির্জনতায়, টিনের শেডটার গোপন আড়ালে। চমক লাগার দপদপানি কমার আগেই বুকটা তার টিপটিপ করতে লাগল অসম্ভব কল্পনায়।

মিলের কাজ একরকম বন্ধ হয়ে আছে আজকাল, যদিও নতুন ধান নিয়ে জোর কাজ আরম্ভ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। পাকা উঠানে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে ধানের মরাইয়ের চালার মতো ধানঢাকা মটকাগুলি—শেডের ভেতর থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় রহস্যের মতো কিছু একটা নিশ্চয় চাপা দেওয়া আছে ওগুলির তলে, তলার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এসে যা উঠানময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে চোখের ধাঁধার মতো।

কী সে না শুনেছে আর কী সে না জানে নারীপুরুষের ব্যাপার ? তবু ক্ষণে ক্ষণে হৃৎকম্প হতে থাকে গৌরাঙ্গের। মানুষ কী বলে আর কী করে মেয়েমানুষকে নিয়ে এ অবস্থায় ? চিন্তামণি যদি হেসে ফেলে ! চিন্তামণি যদি নীলকণ্ঠের সেই বড়ো মেয়ে তরুবালার মতো গালে তার টোকা মেরে বলে, আ মরণ !

রাগ করেছ ? বাবুর নাম করে ডেকে এনেছি বলে ?

উঁহুঁ, না,

ওদের সামনে কী করে বলি আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তাই তো বাবুর নাম করলাম।

বাবু ডাকেনি ?

না গো না। আমি ডেকেছি, সব শুনব বলে। না শুনে যে চলে এলাম। তবু কত কথা শোনালে মাগি একটু দেরির জন্যে, দাসী বই তো নই ! তারপর কি হল ? ওই যে বলছিলে ফসল বিক্রি করে দিয়েছে না কি করেছে তোমার কাকা ?

গৌর একটু ধাতস্থ হয়। একটু জ্বালাও বোধ করে কেমন এক ধরনের।

এই জন্যে ডেকেছ ? সকালে শুনলে হত না ?

রাতে ঘুম হত ভেবেছ আমার ?

শুনে দেহমন যেন চোখের পলকে উল্লসিত হয়ে সাম্য লাভ করায় গৌরের ভয় ভাবনা উপে গেল। উঁচু টানে বাঁধা তারের মতো টনটন রনরন করতে লাগল সে।

সহজ সরল ভাবে সে বলে গেল সব কথা। রঘুকে যতটা বলেছিল তার চেয়ে বেশি, অন্য ভাষায়, অন্য কায়দায়। তার ভয় ভাবনা আপশোশের কথা সে বর্ণনায় আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে গেল।

চিন্তামণি জোর দিয়ে বলল, না মামলা কোরো না। কাল গিয়ে বাতিল করে দিয়ো নালিশ। আপসে যদি ভাগ পাও তো পাবে নইলে কাজ নেই।

টাকাটা মাঠে মারা যাবে নালিশের।

বোকার মতো কাজ করলে ওমনি যায়।

অত বেশি অন্তরঙ্গ আপনজনের মতো চিন্তামণির এই বকুনি শুনে গৌরের সাহস যেন বেড়ে গেল। শেডে ভেজা ধানের পচাটে গন্ধ অনুভব করতে করতে ফাটল ধরা চোকলা ওঠা সিমেন্টের নোংরা মেঝেতে ঘষরে গিয়ে সে চিন্তামণির গা ঘেঁষল। চিন্তামণি নিশ্বাস ফেলে বলল, আ মরণ !

চার

ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। ঋণের বোঝায় চাষি কাতর। ফসল ঘরে তোলা তক ক টা দিনও কিছুতে কাটাতে না পেরে এখনও বাজু পইছা ঘটি বাটি বাঁধা পড়ছে। পেট ভরে ক জনেই বা কবে তারা খায়, এখন তাতেও টানাটানি পড়েছে ফসল তোলার আগে, সিকি থেকে আধেক নেমে গেছে সেই অ্যাতটুকু খোরাক। মাটির কুঁড়েয় ক জনেই বা কবে তারা হাসে, এটুকু তবু যে ভোঁতাটে খুশি খুশি দেখাত তাদের মুখ সে মুখে ঘনিয়েছে প্রাণহানিকর বিমর্ষতা। মাঠে মাঠে এমন যে ভালো ফসল হয়েছে এবার, তা দেখেও না জুড়োচ্ছে তাদের চোখ, না থামছে দেহমনের পোষমানা শান্তশিষ্ট নালিশ-ভোলা জ্বালা। এমন দিনে চাষি হয়েও গৌরের মনে কিনা থইথই করছে মহুয়ার মিঠে নেশার মতো সুখের মাতলামি ! একটা মা নিয়ে তার সংসার, সে সংসার ঘাড়ে চেপেছে এই সেদিন, সে কী জানবে চাষ করে বাঁচার কত মজা ! চাঁদ বেশ কৃপণ আর হিসেবি। তার সাথে থাকার সময় বরং

গৌর খানিক খানিক স্বাদ পেয়েছে গরিব চাষির পরার খাওয়ার কষ্টের। শুধু ওই কষ্ট, মনের কিছু নয়। অনেকের দায়িক হয়ে অবিরাম ঠ্যাঙানো খাওয়া ভীরু মন ভাবনার ভারে যে ভাবে ধুঁকতে থাকে সেটা সে এখনও শিখতে পারনি। কম করে শ খানেক ও রকম আধমরা মানুষের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে, তবু। চাঁদকাকার কাছে ভাগ পেয়ে সবে ভিন্ন হয়ে মা আর গাইটা পুষে সে একরকম সুখেই আছে এখনও। গাইটিও আবার রোজগেরে। অঢেল প্রেমে গা ঢেলে দিতে তার বাধা কই ?

চিন্তা বলে যায়, আজ যেয়ো।

বলে যায় সাঁঝের আগে। তারপর সন্ধ্যা নামে তো রাত আর বাড়ে না গৌরের। মন যত চনমন করে অধীরতায়, গা যেন ততই থমথম করে ধৈর্য ধরার জ্বরে। সেদিনের চাঁদ ক্ষয়ে গেছে অনেকখানি, মাঝরাত্রি পেরিয়ে তবে ওঠে। মাঝরাত্রির অনেক আগেই গৌর তারার আলোয় পথ দেখে রওনা দেয় হরের্নাম রাইস মিলের দিকে।

মা বলে, কুথা যাস বাবা ? রেতে ?

রঘুর সাথে সলা আছে।

দরজার হুড়কো খোলা তক মা চুপ মেরে থাকে। তারপর আচমকা বলে, বিয়া করলে হয়। রেত বিরেতে বাইরে যাওয়া ভালো না বাবা। বাইরে যেতে নিষেধ করা নয়, সমালোচনা নয়। একটু বিবেচনা করতে বলা, ঠান্ডা মাথায় হিসেব করে দেখতে বলা যে একটা বিয়ে করলেই যখন চলে, এত হাঙ্গামায় কাজ কী।

ও সব কিছু না। কপাট দে।

তা বটে। বিয়ে একটা করলে হয়। চিন্তামণির সঙ্গে ভাব হবার পর থেকে কথাটা বেশি করে গৌরের মনে জাগছে, মার মনে পড়িয়ে দেবার কোনো দরকার ছিল না। বিয়ে করার মানেও যেন তার কাছে বদলে গেছে, একটা অস্পষ্ট অভাব বোধের চাপ পরিণত হয়েছে নতুন পিরিতের মন-কেমন করা ঔৎসুক্যে। চিন্তামণির জন্য সারাদিন তার ছটফট করার ভাগ কচি বয়সের বাড়ন্ত বউদের পাওনা হচ্ছে, তাকে তারা টানছে চিন্তামণিকে নিজেদের টান ধার দিয়ে। নইলে চালকলের দিকে রওনা দিয়েও যার জন্য রওনা দেওয়া সেই একজনকে ছাড়া তার কেন মনে পড়বে ভোলার মেয়ে কালী, রঘুর ভাগনি পাঁচি, কেষ্ট শম্ভু পরাণ রসিকদের নতুন বউ আর দাঁতপুরে তার মামাবাড়ির পাড়ায় যে একটা মোটাসোটা মেয়ে থাকে, এদের কথা ? এ সব ভালো লাগে না গৌরের। ভেসে যাওয়ার সুখে মশগুল হয়ে তীরে ওঠার কথা ভাবে, একি জলের বানে ভাসা নাকি তার, অ্যাঁ ?

চাষির গাঁ কখন ঘুমিয়েছে, তার কত পরে বাবুর বাড়ি সংসারের পাট শেষ হয়ে ঘরে ঘরে আলো নিভেছে আন্দাজ করে সে পথে বেরিয়েছে। হয়তো এই একটানা দীর্ঘ প্রতীক্ষার উত্তেজনা শেষ হওয়ার সময় এসেছে বলেই মনটা তার বিমর্ষ হয়ে ঝিমিয়ে যায়। এ প্রণয় তার জুড়িয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়ে একটা তামাশায় দাঁড়িয়ে যাবে ? সে তামাশা আজ কি গৌরের সয় !

ঘেরা শেডের নীচে পচা ধানের গন্ধ পারে না, কিন্তু তারপর চিন্তামণি এলে তার একরাশি চুলে পচা নারকেল তেলের গন্ধ তাকে বাঁচায়। চোখের পলকে সে টের পায় চিন্তামণিকে ছাড়া সে তো বাঁচবে না !

কিছু রাত হাতে রেখে চিন্তামণি বলে, ইবারে এসো। এট্টু না ঘুমোলি বাঁচব নি।

শক্ত মেঝেতে শুধু একটা চাদর বিছানো বালিশহীন শয্যা ছেড়ে গৌর উঠতে চায় না। বেজার হয়ে বলে, কাল ঘুমিয়ো, দুকুর বেলা।

চিন্তামণির হাসির সঙ্গে হাই উঠে।—কাজ নেইকো ? মোর কাছে বাচ্চা দুটো গছিয়ে গিন্নিমা দুপুরে ঘুমোয়। মজার কথা বলি শোন, ঘুমুলে গিন্নিমার নাক ডাকে ! মাইরি বলছি—তোমায় ছুঁয়ে।

মেয়ে মানষের নাক ডাকা ! হাসি যা পায়। আবার হাই তুলে চিন্তামণি বলে, দিনভোর খাটতে হয়। ঘুম পাচ্ছে, সত্যি। দুটি ভাতের জন্যে দেহ পাত করে খাটছি। ভাতার তো নেই দুটি ভাত জোগাবে পোড়া পেটের জন্যে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে এই কথাটা দু-একবার বলে চিন্তামণি, তার কেউ নেই বলে পেটের জ্বালায় দাসীগিরি করে তার জীবন গেল। শুনে মন খারাপ হয়ে যায় গৌরের। দরদ আর সহানুভূতিতে বুকটা তার ব্যথা করে।

সত্যি, পরের খাওয়া বড়ো কষ্ট।

এত রাতে আদর দিয়ে তার এই কষ্ট দূর করার চেষ্টা চিন্তামণি কাঠ হয়ে গ্রহণ করে। তারপর সে এলিয়ে যায়। তারও পরে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ে।

গৌর প্রথমে শুধোয়, ঘুমোলে নাকি ? তারপর চোখের জলের সন্ধান পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে তার কান্না কেন, কীসের জন্য। শেষে গভীর দুঃখে আর অভিমানে কাতর হয়ে উঠে বসে বিড়ি ধরায়, নিজের হাঁটু মোড়া পা দুটিকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে থাকে।

তখন এক কাণ্ড ঘটে অদ্ভুত। তার পায়ের পাতায় হাত রেখে সলজ্জ খেদের সুরে চিন্তামণি বলে, মাপ করো। শুনছ ? মাপ চাইছি তোমার ঠেয়ে। আর কিছু চাইনে আমি, সত্যি চাইনে। যদি চাই তো খান্‌কি বোলো মোকে।

ঘুমে যে ঝিমিয়ে গিয়েছিল এমন হঠাৎ তার আবেগের তীব্রতায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে গৌরের। পা ছেড়ে মাথাটা তার বুকে চেপে ধরে এত জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে চিন্তামণি যে এক মুহূর্তে যুবক গৌর নিজের কাছে শিশু হয়ে যায়।

ভোরের আগে একটু শীত শীত ভাব দেখা দিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে শ্রান্ত অবসন্ন মন দিয়ে গৌর বুঝবার চেষ্টা করে, তার কাছে কী চায় না চিন্তামণি, কী চাইবে না কখনও। এর মধ্যে কোনোদিন সে কি কিছু চেয়েছিল তার কাছে, কোনো আবদার জানিয়েছিল, সে কানে তোলেনি ? সে কি পয়সা কড়ি চায় তার কাছে ? কাপড় গয়না ? মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞেস করতেও খেয়াল হয়নি বলে গৌরের আপশোশের সীমা থাকে না।

পরদিন দুধ নিতে এলে দেখা গেল চিন্তামণির মুখ চোখ ভারী দেখাচ্ছে। এক নজর তাকিয়েই গৌরের মনে হল সে ভয়ানক রাগ করেছে, মুখ ভার করে আছে দুরন্ত অভিমানে। তাদের ভালোবাসার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কিছু যে ঘটতে পারে জগতে গৌরের আজকাল সেটা খেয়াল হতে চায় না।

না না। রাগ করিনি। গিন্নিমাকে ফাঁকি দিয়ে দুকুরে খুব একচোট ঘুমিয়ে নিয়েছি। তুমি বললে না কাল ?

জ্বরজারি হয়নি তো ?

এটটু হয়েছে। দুধ দোয়া বন্ধ করে গৌর ফিরে তাকাতে সে বাঁকা চোখে চেয়ে একটু হেসে বলল, পিরিতের জ্বর গো। তোমায় দেখে সারল।

গাই বাছুরের গা চাটে, দুধের পাত্রে চোঁক চাঁক শব্দ হয়, মৃদুস্বরে তারা আলাপ করে। গৌরের প্রশ্নের জবাবে চিন্তামণি গভীর এক রহস্য সৃষ্টি করে জানায় যে কই, সে তো কিছু চায়নি গৌরের কাছে। কিছু যদি তার চাওয়ার থাকেই, গৌর নিজে থেকে তাকে তা দেবে, সে চাইতে যাবে কেন ! তবে কিনা, একটু ভয় করছে চিন্তামণির, এ ভাবে কতদিন তাদের দেখাশোনা চলবে ? রোজ তার ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ দেখে গিন্নিমা বোধ হয় সন্দেহ করেছে মনে হয়। এমন করে তাকাচ্ছে গিন্নিমা আজ কদিন থেকে, এমন সব কথা বলছে তাকে বকবার সময় !

আজ আবার পটলবাবু মস্ত একটা তালা সেঁটে দিয়েছে মোদের ঘরটার কপাটে।

জেনেছে নাকি পটলবাবু ?

গৌরের বিবর্ণ মুখ দেখে আর সচকিত প্রশ্ন শুনে চিন্তামণি খানিক তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, শেষে নীচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে নিয়ে বলল, নতুন ধান আসবে বলে তালা দিতে পারে।

জানাজানি হলে মুশকিল।

কী মুশকিল। কার মুশকিল ! তোমার নাকি ?

গৌর চুপ করে থাকায় সে আবার বলল, তুমি তো পুরুষ মানুষ।

পাকা লোক হলে গৌর মনে করিয়ে দিতে পারত যে সে বিদেশিনি, শুধু দেশে ফিরে গেলেই যার আসান হয় সে আর এমন কী মুশকিল ! অত হিসাব গৌর এখনও শেখেনি।

তোমার আমার দুজনেরই মুশকিল। তুমি কী করবে ?

কী আর করব, দেশে চলে যাব।

তা বটে। চিন্তামণির সে উপায় আছে। আটকা পড়বে সে, তার তো পালাবার পথ নেই। অবেলার ঘুমে চিন্তামণির ভারী মুখ যে অন্ধকার হয়ে এসেছে গৌরের আর তা নজরে পড়ল না। নিজের মুখ তার শুকিয়ে ছোটো হয়ে গেছে। তার গোপন প্রেমের অনেকগুলি বিপজ্জনক পরিণতির সম্ভাবনা আচমকা হুড়মুড় করে তার বুদ্ধি-বিবেচনার ঘাড়ে এসে পড়ায় সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। ঘুরে ফিরে একটা কথাই কেবল তার মনে পড়তে থাকে যে এ শুধু তার চাষির সমাজে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের জানাজানির ব্যাপার নয়, এ ব্যাপারে যোগ আছে বাবুদের। চিন্তামণিকে মধুবনাতে নিয়ে এসেছে পটলবাবু। বাবুরা যদি তাকে শাস্তি দেয়, যদি বিপদে ফেলে, যদি জেল খাটায়, জানাজানি হয়ে গেলে ! চাষির সমাজে তার শুধু একটু দুর্নাম হবে, কিন্তু বাবুরা রাগি, মানী, নিষ্ঠুর মানুষ, প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের গায়ের জ্বালা কি জুড়োবে সহজে !

পরদিন সকালে গৌর মামাবাড়ি রওনা হয়ে গেল। তার মনে হল, কদিন একটু দূরে গিয়ে থেকে আসাই ভালো। রঘুকে বলে গেল, মাকে যেন দেখাশোনা করে, গরু দুইয়ে দুধ যেন জোগাড় দেয় বাবুর বাড়ি।

মামাবাড়ি হঠাৎ কেনে ?

বড়োমামা একটা বাছুর দেবে বলেছিল, নিয়ে আসি।

গৌরের মামাবাড়ি দাঁতপুরে। বাসে প্রায় আধঘণ্টার পথ পৃথীপুর, সেখান থেকে দুকোশ দূরে সিউতি নদী পেরিয়ে দাঁতপুর। নদী খুব চওড়া কিন্তু মোটেই গভীর নয়, দুটি তীর নদীর তল থেকে মানুষ সমান উঁচু হবে কি হবে না। বর্ষার ক মাস নদীতে লাল জলের স্রোত বয়ে যায়, ময়লা থিতিয়ে জল পরিষ্কার হতে না হতে জল যায় ফুরিয়ে। এক তীর ঘেঁষে ছোটো একটি ঝরনার মতো স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে যায়, নদীর বিস্তীর্ণ সমতল বুকে বালি চিকচিক করে।

বাস আজকাল বন্ধ। ট্রেনে চেপে গৌর সিউতি নদীর পুল পেরিয়ে সানকানি স্টেশনে নামল। এদিকে শালবন বেশি, ছোটো স্টেশনটির লাল কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে কিছুদূর গিয়েই রেললাইনের দু পাশে শালবন শুরু হয়েছে।

স্টেশনের বাইরে একদল সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো কোথায় কুলির কাজ করতে যাবে, রান্না-খাওয়ার জন্য এ বেলা এইখানে ঠাঁই গেড়েছে। কালো মাটির হাঁড়িতে ভাত চেপেছে, কুপিয়ে কাটা হচ্ছে মোটা একটা ঢ্যামনা সাপ। রান্নার এই মাটির হাঁড়িকুড়ি সব সঙ্গে নিয়েই এরা রওনা দেবে, পুরুষ ও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা টানবে শালপাতা পাকানো মোটা বিড়ি, মায়েরা কাপড় দিয়ে শিশুদের বেঁধে নেবে পিঠে। সাঁওতালদের চাষের কাজ অতি সামান্য, বনের ধারে বা বনের মধ্যে জঙ্গল সাফ করে যেমন তেমন খানিক ফসল ফলায়, তাও সকলে নয়। তবু এদের বড়ো ভালো লাগে গৌরের, জন্ম থেকে এদের চলাফেরা চালচলন দেখে এলেও ওরা তার মনে একটা

রহস্যের সৃষ্টি করে রেখেছে, একটি ছিপছিপে কিন্তু পরিপুষ্ট সাঁওতালি মেয়েকে বিয়ে করার অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা আজও তার মনে উঁকি দিয়ে যায়। অমন মেয়ে চাষির ঘরে জন্মায় না।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক বেলায় মামাবাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গৌরের কানে এল একক একটি শানাইয়ের সুর। শানাই শুনলে গৌরের মন কেমন উদাস হয়ে যায়, মনে হয় বাকি জীবনটা ঠাকুরদেবতাকে ভক্তি করে, গুরুজনকে মান্য করে আর পরস্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে কেবল ভালো কাজ করে কাটিয়ে দেওয়া চাই। সে মরলে সবাই যেন বলে, লোকটা বড়ো ভালো ছিল গো।

গৌরের মামাদের মস্ত সংসার, পায়ের ধুলো নেওয়া দেওয়ার পালা সাঙ্গ করে গৌর শুধোল, শানাই বাজে কার বাড়ি গো ?

কুনুর মেয়্যার বিয়া—লক্ষ্মীর। সেই যে মুটকি মেয়েটা ঘন ঘন আসত মোদের বাড়ি—

বটে ?

বর আজ এসে গিয়েছে, কাল সন্ধ্যাবেলা বিয়ে। আজ কুটুম ভোজন কাল স্বজাতি ভোজন হবে। কুনুর নাকি ভয়ানক ফাঁকি দেবার মতলব আছে শোনা যাচ্ছে, দই চিঁড়ে আর মোটে একটা করে মিষ্টি দিয়ে সেরে দেবে। জোড়া মিষ্টি না দিলে গোলমাল হবে শোনা যাচ্ছে। কুটুমদের দেবে জোড়া মিষ্টি আর মোয়া, স্বজাতির বেলা শুধু একটা মিষ্টি—সইবে কেন স্বজাতিরা !

তোর বিয়েতে নুচি খাব গৌর।

বড়োমামি ক্ষীণকণ্ঠে বলল। বড়োমামি জীবনে আঁতুরে গিয়েছে সতেরোবার, একটা বয়সে স্ত্রীলোকমাত্রেরই সন্তান ধারণের ক্ষমতা ফুরিয়ে যাবার ব্যবস্থা বিধাতার না থাকলে হয়তো আরও দু-চারবার যেত। সতেরোটি এলেও আটটি সন্তান অতি শৈশবে এবং দুটি অল্পবয়সে চলে গিয়েছে তাই রক্ষা। সাতটির মধ্যে তিনটি মেয়ে পরেরা ঘরে নিয়ে পুষছে, তাও রক্ষা। তাছাড়া, সবগুলি এসে পড়বার আগেই বড়ো দুটি ছেলে পর পর বড়ো হয়ে পর পর রোজগার করতে শিখেছে। শেষ বিয়োনোর পর দু-বছর কেটে গেছে, কেন বেঁচে আছে না জেনেই বড়োমামি টিকে আছে ক্ষয়রোগিণীর মতো জীর্ণশীর্ণ শরীর নিয়ে। জ্বর হয় মরে না, কাশি হয় মরে না, হজম না হওয়ায় প্রায়ই কাপড় বিছানা নষ্ট করে আর নিজের মনে অনর্গল কথা বলে বেঁচে থাকে।

বড়োমামা অদ্বৈতের বয়স ষাট হবে। চুলটুল পেকে সে বুড়ো হয়নি কিন্তু বৈষ্ণব হয়েছে।

তার অসাধারণ কৃষ্ণভক্তির কথা দাঁতপুর আর আশেপাশের গাঁয়ে ছড়িয়ে গেছে। কত লোক স্বচক্ষে দেখেছে কৃষ্ণলীলার যাত্রার গান ভেঙে চুরে গাইতে গাইতে দুচোখে তার জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে !

এত লোকের মধ্যে সেই প্রথম উদাসীন আপনভোলা সুরে গৌরের আসবার কারণ জিজ্ঞেস করল।

বাছুর ? বকনাটা ? তোকে দিব কথা ছিল নাকি বটে ?

ছিল না ? মাকে না-হোক বিশবার বলেছ দুধ ছাড়লে পাঠিয়ে দেবে মাস দুয়েকের মধ্যে নয়তো খবর দেবে, আমি এসে লিয়ে যাব। ও বাছুর আমার মামা, দিতে হবে, চালাকি নয়, হাঁ।

অদ্বৈত চোখ বুজে গদগদ হয়ে বলল, অ গৌর, তোর ভাগ্যি ভালো, বড়ো ভালো তোর ভাগ্যি।

গৌর সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করল, কীসে ?

বাছুরটি প্রভু গর্‌হন করেছেন।

অদ্বৈতের গুরুঠাকুর এসেছিলেন মাঝখানে, যাবার সময় পাটল রঙের বাছুরটির গলার দড়ি স্বয়ং শ্রীহস্তে ধারণ করে নিয়ে গেছেন। বাছুরটি আগেই যখন গৌরকে দেওয়া হয়েছিল। পুণ্যটা তারই হয়েছে সন্দেহ কী !

জানিস গৌর, অ বাবা জানিস ? বলি শোন তোকে। শোন কী অবাক কাণ্ড। যাবার আগে বলা নেই কওয়া নেই প্রভু তোর কথা শুধোলেন। তখন টের পাইনি, আজ জানছি, তেনা জানতেন। কিরপা করলেন তোকে। ভক্তির লেশটুকু তো মনে তোর নাই কিনা তাই তোর বাছুরটি গর্হন করে তোকে কিরপা করলেন।

গৌরাঙ্গ থ বনে থাকে, আপশোশে আর বিস্ময়ে। কুনুর মোটাসোটা মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে শুনে মনটা তার মস্ত একটা ক্ষতি বোধের চাবুক খেয়ে ছ্যাঁত করে উঠেছিল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ছিল ন্যায্য পাওনা ফসকে যাওয়ার ক্ষোভ। এ আরেকটা ক্ষতি, পাওনায় ফাঁকি পড়ায় কিন্তু ভালো করে ক্ষুব্ধ সে হতে পারল না। তার বাছুরটি একজন বাগিয়ে নিয়েছে ভেবে সে রেগে উঠতে যায়, কিন্তু সেই একজনটি এমন আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী যে মামারা তাকে বাছুরটি দিয়েছে একথা না জেনেও জানতে পারেন বলে রাগ আর তার করা হয় না।

পুঁইডাঁটার চচ্চরি আর কুচো চিংড়ির টক দিয়ে তিনটে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে সে ভাত খায়। কাঁসার ভাত শেষ করে একবার চেয়ে ছোটো একমুঠো ভাত পেয়েও আবার সে ভাত চাইতে তার মেজো সেজো দুই মামি মুখ চাওয়াচাওযি করে আজ দুজনেই প্রায় একসঙ্গে অনেক দুঃখের পোড়া একটু হাসি হেসে গৌরকে আরও ভাত দেয়। ভাগ্নে এসেছে মামার বাড়ি, নিজেরা উপোস দিয়েও তার পেটটা ভরাতে হবে বইকী মামিদের।

গৌরের মামাদের অবস্থা চিরদিনই মন্দ, দুর্বৎসরে বড়ো কষ্টে দিন যায়। কিন্তু মানুষ তারা পরম শান্ত, সন্তুষ্ট এবং ধার্মিক, একান্নবর্তী আদর্শ চাষির পরিবার। গোঁয়ার শুধু গৌরের ছোটো মামা রাধাচরণ। তার ঘরে মন নেই, চাষে মন নেই, গাঁয়ে মন নেই। বছরে দু-তিন মাসের বেশি সে বাড়ি থাকে না। কোথায় যায়, কী করে স্পষ্ট করে কোনোদিন সে কিছু বলে না, হঠাৎ একদিন কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি আসে, বাকি খাজনা বা ঋণ বা অন্যান্য আপদ-বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয় সংসারকে তখনকার মতো, কিছুদিন পরে আবার উধাও হয়ে যায়।

অদ্বৈত বলে, মজুরগিরি করে নির্ঘাত, কুলি খাটে। চেহারা দেখছ না মজুরের মতো হচ্ছে দিনকে দিন ?

কেউ বলে, মজুরগিরি করে টাকা আনবে, ইস রে !

অদ্বৈত বলে, ভারী টাকা। বিশ-পঁচিশটার বেশি টাকা এনেছে কোনোবার ?

গৌরের এই ছোটো মামাটির একখানি চিঠি এসেছে অদ্বৈতের নামে দিন তিনেক আগে, এখনও সেই চিঠি নিয়ে পাড়াসুদ্ধ মামার বাড়িটি সরগরম হয়ে আছে। কলকাতার কাশীপুর থেকে শতকোটি প্রণাম দিয়ে রাধাচরণ নিবেদন জানিয়েছে যে চার চারটে জোয়ান মদ্দ পুরুষের বাড়িতে বসে থাকার কী দরকার আছে বাড়ির ভাত ধ্বংস করে ? বড়ো আর মেজো ভায়ের বয়স বেশি—তারা ঘরে থেকে চাষ আবাদ দেখুক, তার সেজোভাই আর জোয়ান ভাইপোরা চলে যাক তার কাছে সেই কলকাতার কাশীপুরে, কাজ করে রোজগার করুক তার মতো। সে কাজ জুটিয়ে দেবে।

গৌরের কৌতূহল জাগে। কী কাজ লেখেনি কো ?

লিখবার দরকার ? মজুরগিরি, কুলিগিরি কাজ, আবার কী। জানিস গৌর, পরভু বলেন, ওটা কংসের সম্বন্দির অবতার, আমার ওই ভাইটা। সংসারটা ওই ছারেখারে দেবে। বাপের কোনো অভাব ছিল মোদের ? জমিজমা, গাইগরু, গাছপুকুর সব ছিল সে থাকার মতো। ওটার জন্মো থেকে অবস্থা পড়তে লাগল মোদের।

নামজপের প্রক্রিয়ায় অদ্বৈতের ঠোঁট নড়তে থাকে।

জবাব দাওনি কো ?

দিব। জবাব দিব।

গৌরের জোয়ান জোয়ান মামাতো ভাই রাখাল, প্রসাদ, কানাই বংশীরা মুখ বাঁকায় আর হাসে, হাসে আর মুখ বাঁকায়। ওরা প্রায় সকলেই জোতদার ভূষণ নন্দীর মজুরি করে—জমিতে, চাষের কাজে।

কুনুর বাড়ি শানাই বাজায় চণ্ডী। সস্তা শানাই, খাওয়া আর দৈনিক চার আনা। শানাই বাজানো চণ্ডীর ব্যাবসা নয়। বাড়িতে একটা বাঁশি আছে, আশেপাশে গাঁয়ের কেউ ডাকলে বাজিয়ে আসে। পোঁ ধরারও কেউ তার সঙ্গে থাকে না। তবু তার সেই বেসুরা বেতালা শানাই গৌরকে উতলা করে দেয়। রাত্রে চাটায়ে শুয়ে শানাইয়ের সুর কানে না এলেও ব্যাকুলতা তার বেড়েই চলে। হাঙ্গামার ভয়ে গন্ডগোলের প্রথম চোটটা এড়িয়ে যাবার জন্যেই সে যে পালিয়ে এসেছে এ চিন্তাটিকে সারাদিন আমল দিতে অস্বীকার করেই নিজের কাছে সাফাই গাওয়ার প্রয়োজনকে সে এড়িয়ে গেছে, এখন ভণ্ডামি তার ভালোও লাগে না, কাজেও লাগে না।

চিন্তামণির দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। নীলকণ্ঠবাবু তাড়িয়ে দিলে সে হয়তো তার বাড়িতে আসবে তার খোঁজে, কিন্তু তাকে কিছু না জানিয়ে সে মামাবাড়ি চলে গিয়েছে শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বে। ভাববে, এমনই হয়, গৌরের মতো লোকের সঙ্গে পিরিত করলে এমনই হয় শেষতক।

মামাদের সঙ্গে সে দুপুরে কুনুর বাড়ি ফলার করতে গেল। বিয়ে আজ গোধূলি লগ্নে কিন্তু জাতভায়েরা অনুমোদন না করলে বিয়ে হতে পারবে না। দুপুরে সকলের ভোজনটা হবে অনুমোদন ! প্রায় জন ত্রিশেক লোক হয়েছে, ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়ে। এদের মাত্বর নবকান্ত মাইতি। তারই আশেপাশে এলোমেলোভাবে বসে বয়স্করা জোড়ায় দু-জোড়ায় নানা কথা আলাপ করছে আর মাঝে মাঝে খিদেয় কাতর ছেলেমেয়েগুলির ওপর খিঁচিয়ে উঠে চড় চাপড় মারছে। কুনু দুবার জোড় হাতে সকলকে তাগিদ দিয়েছে কিন্তু কেউ উঠে গিয়ে খেতে বসেনি। খিদে পেয়েছে সকলেরই, খিদে নিয়েই সকলে নেমন্তন্ন রাখতে এসেছে, কিন্তু খাওয়া সম্বন্ধে সবাই যেন একান্ত উদাসীন !

কুনু আবার আসে, বলে, বেলা যে অনেক হল ! দয়া করে গা তুলতে আজ্ঞা হয় মাইতি মশায়।

এবার নবকান্ত বলে, কুটুমদের নাকি একগন্ডা মিষ্টি মিলেছে কুনু ?

একগন্ডা ? কুনু কপালে চোখ তুলে জবাব দেয়, একটোর বেশি মিষ্টি দেবার খেমতা আছে যে দেব ? একটা মিষ্টি দিইছি, নার্কলে। আপনাদের জন্যে চন্দ্রপুলি আর মোয়া।

মোয়া ?

মুড়কি নয়তো মোয়া, যার যা পছন্দ।

কটা মোয়া ?

কুনু একটু ভাবে। চকিতে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নেয়।

দুটো মোয়া। মোয়ার বদলি পোয়া মুড়কি।

তখন সকলে গাত্রোত্থান করে খেতে গেল। কুটুমদের সমান সম্মান আদায় করা হয়েছে, এখন আর ভোজন করতে অপমান নেই।

দাওয়ায় বসে খেতে খেতে লক্ষ্মী বার তিনেক গৌরের নজরে পড়ল। কাঁচা হলুদ মাখিয়ে মাখিয়ে তার নিজের বাদামি রঙ মেয়েরা প্রায় লোপ করে দিয়েছে। কেমন শুদ্ধ আর পবিত্র দেখাচ্ছে মোটা মেয়েটাকে।

গৌর তাকে না বলে আচমকা মামাবাড়ি চলে গিয়েছে শুনে প্রথমটা চিন্তামণি রাগে অভিমানে চারিদিক অন্ধকার দেখেছিল, তারপর ভেতরে কেমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গিয়ে তার নিজেরই মনে হল সে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচে গেছে। এমন ভীষণভাবে কোনো মানুষের কাছে ধরা পড়ার স্বভাব

তার নয়। গৌরকে নিয়ে নিজেকে একেবারে বেমালুম ভুলে যেতে বসেছিল, কী এমন মানুষটা গৌর ? চালচুলো ছাড়া কীইবা আছে ওর যে ওকে নিয়ে মেতে থাকলে তার সুখের সীমা থাকবে না ? কী প্রত্যাশা আছে ওর কাছে ?

অন্তত কদিনের জন্য গৌর দূরে চলে গেছে, দিনান্তে তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হবার সম্ভাবনাও এখন নেই, এটা খেয়াল করার সঙ্গে চিন্তামণি আজ প্রথম সচেতন হয়ে উঠল, মনটা তার কীভাবে গৌরময় হয়ে উঠছিল দিন দিন। ঘুম ভেঙে সে ভাবতে আরম্ভ করত গৌরের কথা, দেখা হলে কী বলবে, কী করবে আর কী হবে এই কথাই ভাবত বিভোর হয়ে সারাটা দিন। বাড়ির গিন্নি আর তার মেয়ের কাছে এ জন্য কতবার যে বকুনি খেয়েছে। যা হয়েছে তার জন্য চিন্তামণির কোনো আপশোশ নেই। অপরূপ স্বপ্ন দেখার আনন্দেই বরং হৃদয় তার ভরাট হয়ে আছে। গৌরের কথা সে এখনও ভাববে, গৌরের জন্য যে মন কেমন করছে তাও মানবে, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি আর নয়। একটু সামলে নিতে হবে নিজেকে, চারিদিকে তাকাতে হবে। দু-একজন যে কামনা করছে তাকে, অনেক কিছু প্রত্যাশা করা যায় এমন দু-একজন, তাদের সম্বন্ধে এমন উদাসীন হয়ে থাকলে তার চলবে না। গোপনে দু দণ্ড দেখা দেওয়া ছাড়া গৌর তাকে কিছু দেবে না সে জানে। তাকে নিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে বসবাস করার সাধ্যও বোধ হয় গৌরেব নেই। সাধ থাকলেও ভরসা পাবে না। জানাজানি হবার আশঙ্কায় গৌরের মুখ সেদিন কী রকম পাংশু হয়ে গিয়েছিল চিন্তামণি তা ভুলতে পারেনি।

এই জ্বালাটাই তার বেশি। জোয়ান ছেলে, মা ছাড়া সংসারে কেউ নেই, কোথাও কারও কাছে বাঁধন নেই, কোনোরকম, তাব কেন এত ভয় তাকে নিয়ে ঘর করার, তাকে ভাত কাপড় দেবার ! পটলের অস্তিত্বই সে একরকম ভুলে গিয়েছিল। চিঠিপত্র লেখা আর পড়ার কাজটা আজকাল তার গৌরই করে দিত—পটলের মতো অনায়াসে অবশ্য নয়, অতি কষ্টে। প্রত্যেক চিঠির দু-দশটা কথা সে তো পড়তে পারেনি। চিন্তামণি যেচে পটলের সঙ্গে আবার আলাপ জমায়। বলে, কথাই দিকি বলেন না পটলবাবু।

পটল বলে, যা তোমার দেমাক।

মুখখানা কাঁদোকাঁদো করে চিন্তামণি করুণ সুরে বলে, দেমাক দেখলেন ? আমার দেমাক ? দুঃখী মানুষ আমি দাসীগিরি করে খাই—

পটল তখন মুচকে হেসে বলে, না করলেই হয় দাসীগিরি !

দিনের আলোয় মানুষটার মুখের পাকামির ছাপের মধ্যে চিন্তামণি সাংসারিক বাস্তব দেনা-পাওনার সম্পর্ক গড়ে তোলার শক্ত পাকা বনিয়াদ খুঁজে পায়। এ যা নেবার নেবে, যা দেবার দেবে। তাদের দুজনের কারও বলবার থাকবে না আদান-প্রদানে কোনোদিন কোনোপক্ষ ফাঁকি দিয়েছে। সম্পর্ক হবে সহজ সাধারণ, দিনগুলি কাটবে নিশ্চিন্ত স্বাভাবিক সুখে। গৌরের কাছে তো চড়া নেশা আর বুক ধড়পড়ানির আনন্দই শুধু মেলে। পর পর দুরাত্রি গৌরের জন্য বড়ো বেশি মন কেমন করার যন্ত্রণা সয়ে চিন্তামণির মেজাজটা তাই আরও বেশি খিঁচড়ে গেল। দিনের বেলা খুঁজে খুঁজে যেচে যেচে আরও বেশি আলাপ করল পটলের সঙ্গে।

পরদিন বিকালে একখানা চিঠি এল চিন্তামণির নামে। পড়ে দেবার জন্য চিঠিখানা হাতে নিয়েই পটল পকেটে পুরে দিল।

রাতে পড়ে শোনাব চিন্তামণি।

ওমা, রাতে কখন ?

অনেক রাতে, সবাই যখন ঘুমোবে। আজ এখানে শুয়ে থাকব, বৈঠকখানায়।

চিন্তামণির মনে হল, তাই হোক। গৌর কবে এসে পড়ে ঠিক নেই, আজ রাতেই বোঝাপড়া চুকে যাক পটলের সঙ্গে। সাতটা দিনও আর সে পার হতে দেবে না, নিজের ঘরে নিজের সংসার

পাতবে। নিজের রান্না করবে নিজে, পরবে নিজের কাপড়, জল তোলা বাসন মাজা ঘর মোছা বিছানা পাতার কাজ করবে নিজের, রাতে পাশে নিয়ে শোবে নিজের পুরুষটিকে। কী জ্বালাতেই জ্বলে যাবে গৌরের বুক !

কী করবে গৌর ?

সকাতর গৌরকে নানাভাবে কল্পনা করার চেষ্টায় সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়, অন্ধকারের সঙ্গে এক অজানা আতঙ্ক ঘনিয়ে আসে চিন্তামণির মনে। হিংসায় বুক ফেটে কি যাবে গৌরের ? দুঃখে সে কি মুহ্যমান হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য ? জীবনের সাধ-আহ্লাদ কিছুই কি তার অবশিষ্ট থাকবে না ? কে জানে কী করবে গৌর ! হয়তো হাঁপ ছেড়েই সে বাঁচবে যে যাক, সব চুকেবুকে গেল ! হয়তো দেখাই সে আর কোনোদিন পাবে না গৌরের !

তা পাবে না। পটলের ভাড়া করা ঘরে গেলে কী করে সে গৌরের দেখা পাবে ? এ বাড়ি ছেড়ে গেলে গৌরকেও তার ছাড়তে হবে জন্মের মতো।

চিন্তায় ভাবনায় যেন অম্বল হয়েছে মনে হল চিন্তামণির। না খেয়ে সে শুয়ে পড়ল। বৈঠকখানায় যাবে কি যাবে না স্থির করতে করতে রাত তিনটে বাজিয়ে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ক্রুদ্ধ পটলের কাছ থেকে চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে সে তোরঙ্গে তুলে রাখল। কাউকে দিয়ে চিঠিখানা পড়িয়ে শুনবার জন্য মনটা তার এমন আকুলি বিকুলি করতে লাগল যে চারদিন পরে তার মনে হল এ যাতনা সহ্য করা যায় না। গৌরের ভাবনার চেয়ে না-পড়া চিঠির জ্বালা তার বেশি হয়েছে।

পরদিন দুপুরে গৌর ফিরে এল।

বড়নিছিপুর

বৈন চিন্তামণি আমি বড়নিছিপুর আসিয়াছি জানিবা। না আসিয়া কি করিব আমার কে আছে আমাকে পুষিবে। পোড়া কপালে এত কষ্ট ভগবান কেন দিয়াছিল মরিয়া গেলে সুখ পাইতাম তা মরণ অদিষ্টে নাই। তুমি আমি দুই বইন মন্দ অদিষ্ট নিয়া জন্মিয়াছি। আমার সোয়ামি থাকিয়া নাই তুমি কচি বয়সে সিঁদুর মুছিলা। তুমি আটটাকা পাঠাইয়াছ তাহাতে কি হইবে জিনিষপত্র আগুণ হইয়াছে। বাবুরা শুদ্ধ দিশা পাইতেছে না কি দিয়া কি করিবে। ছেলাপিলা মাগের ভাত কাপড় দিতে মাথায় হাত দিয়া কান্দে। তুমি আমাকে টাকা পাঠাইয়াছ তাতে কত সুখী হইয়াছি যে দিদিরে তুমি ভুলিলা না নিজে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইলা। নিজ বয়স বুঝিয়া সাবধানে চলিবা মন্দ লোক বুঝিলে কোনো সংসর্গ রাখিবা না। পেটের খিদায় তুমি মধুবনী গিয়াছ ইহা আমারই অদিষ্ট। বড়নিছিপুরে আমি ভূষণবাবুর বাসায় আসিয়াছি। ভূষণবাবুরে তুমি চিনিবা তিনি মোদের গাঁয়ের হালদার মশায়ের বড় জামাই তোমার হাত ধরিয়া টানিতে দেখিয়া যাহাকে গালমন্দ করিয়াছিলাম কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে প্রকাশ করি নাই। আমি ভূষণবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আছি। ইনি এমন ভালো লোক তাহা জানিতাম না। আমাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এখানে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। খিদির পাড়ায় বাপের বাড়ী বৌ প্রসব হইতে আসিয়াছিল তাহাকে আনিতে আসিয়া বলিলেন যে হরমণি তুমি জানাশুনা লোক তোমারে চাকরাণী হইতে বলিতে পারিব না। তুমি খাওয়া পড়া পাইবা সব পাইবা আপনজনের মতো ঘরে থাকিবা। বাসনমাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া সব কাজ করিবা তাহাতে তোমার কিসের অপমান, আমার মা বৈন সংসারের কাজ করে না। তুমি জানিবা যে আমি নীচু জাতের মেয়ালোক আমার সহায় সম্পদ কিছু নাই ছাড়াও এখন না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছি তথাপি আমার মান রাখিলেন। ভূষণবাবুকে দেবতা বলিয়া জানিয়া পায় ধরিয়া কত কাঁদিয়াছি। তাহাতে কিরূপ লজ্জিত হইয়া তিনি

বলিয়াছেন তুমি কেন কান্দিতেছ পায় ধরিতেছ কেন আমি নিজ কর্তব্য করিয়াছি ইহা কিছু নয় তিনি এরূপ দেবতা অপেক্ষা বড়। বড়নিছিপুরের যে মস্ত কারখানা আছে তাহাতে ইনি কাজ করেন। কারখানা তুমি কি দেখিয়াছ এখন কি হইয়াছে। সিংপাড়া গাঁয়ের চিহ্ন নাই সেখানে কারখানা বসিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া থ বনিয়া গিয়াছি।

আশির্ব্বাদিকা দিদি

ছয়

পৃথিবীতে বড়ো একটা যুদ্ধ বেধেছে খবর পেয়েছিল মধুবনী ও তার আশেপাশের সবাই। বাতাসে বাতাসে খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল চারিদিকে। তা যুদ্ধ যদি বেধে থাকে থাকুক, বিলাত দেশে যুদ্ধ বাধবে সেটা আশ্চর্যের কথা কি এমন, গোরু শুয়োর মদ খাওয়া ম্লেচ্ছ জাত, রক্ত গরম, মাথা গরম, ওরা তো যুদ্ধ করবেই যখন তখন। হিংস্র পশুর মতো ও লালমুখো জাতের পরিচয় কি আর জানতে বাকি আছে কারও। ছাব্বিশ আর পঁয়ত্রিশ সালে বাপ বলানো গুঁতোর চোটে মর্মে মর্মে টের পেয়েছে সবাই। ওরা যদি হানাহানি কাটাকাটি না করে, করবে কারা ?

এই তো সেদিনও একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গিয়েছিল ওদের নিজেদের মধ্যে। বেশিদিনের পুরোনো কথা নয় যে বুড়োদের শুধু মনে থাকবে, জোয়ানদেরও স্পষ্ট মনে আছে সে যুদ্ধের কথা। পুরো একটা যুগ ধরে ওরা কি হানাহানি করে মরেনি নিজেদের মধ্যে, সাবাড় হয়ে যায়নি বেশির ভাগ পুরুষ ? মাঝখানে এতদিন যে ওরা যুদ্ধ করেনি সে তো শুধু এই জন্য যে যুদ্ধ করার পুরুষ ছিল না দেশে !

জিনিস ওজন করা স্থগিত রেখে বাঁড়ুজ্জে বলে, কথা তুললে যদি তো বলি শোনো রঘু। লড়াই থামলে সবাই দেখল কি জানো ? দেখল দেশ ভরা শুধু মেয়েলোক, বুড়ি মাঝবয়সি যুবতি কিশোরী সব বয়সের গাদা গাদা মেয়েলোক—পুরুষ যে কটা হাতের আঙুলে গোনা যায়, তার আবার আদ্দেক কানা খোঁড়া। সর্বনাশ ! এ যে জাত সুদ্দু লোপ পাবার জোগাড় ! সবাই মিলে তখন ঠিক করলে বিয়ে টিয়ে তুলে দাও, বল নাচ চালাও। বল নাচ জানো না ?

রঘু, গৌর, নিতাই, পচা, সুবলদের অজ্ঞতায় আমোদ পায় বাঁড়ুজ্যে। বেশি করে খ্যা খ্যা করে খানিকটা হেসে ফট করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নেয়।

বলে, বল মানে ফুটবল নয় হে, গর্ভ। বল নাচ গর্ভধারণের নাচ, আমাদের শাস্ত্রে যাকে গর্ভাধান বলে। যেদিন যত মেয়েছেলে মাসকাবারি চান করে, তারা সবাই সেদিন থেকে বল নাচের আসরগুলিতে যায়—সেদিন থেকে দশদিন, ব্যাস। যে কটা পুরুষ বেঁচেছিল যুদ্ধে, কানা, খোঁড়া সব-সুদ্ধ বলনাচের আসরে থাকে। খানিক নাচানাচি হয়, তারপর—

বাঁড়ুজ্যে গম্ভীর হয়ে বলে, উপায় কি বলো, জাত কি লোপ পেয়ে যাবে ? আমাদের গাই গোরুর কথাই ধরো। এতগুলো গাই, যাঁড় আছে কটা ? গাই নিয়ে সবাই ছোটে একটা দুটো ষাঁড়ের কাছে, উপায় কি ! যুদ্ধ বেধেছে বাধুক। যুদ্ধের জন্যই যারা করে বংশবৃদ্ধি করে, যুদ্ধ করে তারা ধ্বংস হয়ে যাক।

বিদেশে বিদেশিদের যুদ্ধ, মধুবনীর চাষিদের কী সম্পর্ক সে যুদ্ধের সঙ্গে ? জাপান যুদ্ধে নেমেছে ? জাপানও তো বিদেশি। বিলিতি মাল আসে মধুবনীতে, জাপানি মাল আসে। বিলাতও যেমন বিদেশ, জাপানও তাই।

বঞ্চিত নিষ্পেষিত জীবন এদের কাছে স্বাভাবিক সংগত ও অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, সুদূরের বিদেশের যুদ্ধের চাপটা তারা অনুভব করে ধীরে সুস্থে। কোনোমতে বেঁচে থাকার সামান্য প্রয়োজনগুলি এলোমেলো হয়ে থাকার চাপ। কোনোদিকের চাপটা বাড়ে ক্রমে ক্রমে কোনোদিকের চাপ অকস্মাৎ বেড়ে গিয়ে তাদের দিশাহারা করে দেয়। তেল নুন মশলার দোকানে আধলা ছিদামেব বিক্রি বন্ধ হওয়ার মধ্যে তারা ব্যক্তিগতভাবে টের পায় যুদ্ধের ধাক্কা।

জিনিসের দর বাড়ে। কতগুলি জিনিসের দাম একেবারে হয়ে যায় চড়ক গাছ ! কতগুলি দরকারি জিনিস একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় বাজার থেকে। সারা মধুবনীতে বিলেতি ফুড কেনার সমস্যা চাষিদের মধ্যে এক রঘু ছাড়া আর কেউ বোধ করেনি, কিন্তু লাঙলের ফাল, দা, কাস্তে, পেরেকের সমস্যায় ভুগেছে অনেক চাষি। নিতাই কামারের হাপর বন্ধ নয়, কিন্তু হাপর চলেছে শুধু সারাইয়ের কাজে, কিছু তৈরি হবে না, লোহা নেই। বাজারের পুরোনো লোহার কারবারি রামচরণ কদিন আগে হঠাৎ এসে ডবল দাম দিয়ে লোহার গুঁড়োটি পর্যন্ত কুড়িয়ে নিয়ে গেছে নিতাইযের দোকান থেকে। নিতাই কি জানত তখন এমন ব্যাপার হবে ? গোরুর গাড়ির একটা লোহার ডান্ডা রামচরণ কিনে নিয়ে গিয়েছিল সাড়ে পাঁচ টাকায়, আড়াই টাকা লাভ হয়েছিল নিতাইয়ের। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়িটার জন্য সেই ডান্ডা হরেকৃষ্ণবাবু কিনেছেন তেরো টাকায়। সাড়ে সাত টাকা লোকসান নিতাইয়ের।

লাজনতলার সোমবারের হাটে কাপড় কিনত চাষিরা, দাম আট দশ আনা চড়া দেখে দু তিন হাট তারা কেনা বন্ধ রেখেছিল। পরের সোমবার দ্যাখে কি হাটে কাপড় এসেছে মোটে দু চারখানা।

ইঁদুনাথার বব্বুল তাঁতি কেঁদে বলে, হায়রে ঝকমারি ! একা বুনি দু চারখানা, তাতে কি ভাই সংসার চলে ? দশজনেরটা কিনে এনে বেঁচে আছি দু চার গণ্ডা লাভ পেয়ে ! শালা ছিনাত নন্দী টাকা দিয়ে সাপটে সব কিনে নিল ; ভাবলাম বড়ো দাঁও মেরেছি। দেখবি যা নন্দীর ঠেয়ে, দুয়ের তিনের কাপড়ের দর হাঁকছে সাত আট নয়। ইদিকে সুতো পাইনে মাইরি। নন্দী বেটা বলছে, সুতোর আমদানি নেই, কোথা পাব সুতো ! কিছু আছে দিতে পারি, তা দর কিছু বেশি লাগবে। কি দর জানো ? সোনার দর ! আর সালে সোনা কিনিছি ওই দরে নেতার মার নাকছাবির জন্যে। তাঁত বন্ধ গাঁয়ে। সব কটা তাঁত বন্ধ। এ কি হল কাণ্ডখানা ?

এখনও কিছু কাপড় আছে ববুল তাঁতির ঘরে। দিবারাত্রি তার স্বস্তি নেই, ঘুম নেই। যে কাপড় বেচে দিয়েছে সামান্য কিছু বেশি লাভে তার জন্য আপশোশ, বাজারের দর দেখে বাকি কাপড় ছেড়ে দেবার তাগিদ, দর আরও চড়ছে দেখে অপেক্ষা করার লোভ, দর পড়ে যাবার ভয়--কত কি চিন্তা যে ঘুরপাক খাচ্ছে বেচারির মাথায় ! সাতান্ন জোড়া কাপড় একশো তেইশ জোড়া গামছা, দু চারখানা গামছা আবার বেশি দরে কিনেও রেখেছে।

এ সব অভ্যাস নেই ববুলের, বেশিদিন টিকবার সাধ্য তার হয় না। ভেবে ভেবে এমন মাথা ঘোরে আর বুক ধড়ফড় করে তার যে নন্দীবাবুর লোক এসে আরও আট আনা বেশি দিতে চাওয়া মাত্র সব মাল ছেড়ে দিয়ে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

মিলের কাপড় মেলা কষ্ট।

মিল কাপড়ের দর চড়িয়ে নিলে। এই ফাঁকে সুতো পেলে মোদের কিছু হত।

চালের দাম বারো টাকা। ঘরে গৌরের চাল বাড়ন্ত, দুধবেচা পয়সা নিয়ে চাল কিনতে গিয়ে সে শোনে, চালের মন বারো টাকা, মোটা ভাঙা চাল। আড়াই টাকায় গত ফসলের যে ধান সে নিজে বেচেছে, সেই ধানের চাল বারো টাকা !

রঘুর কাছে গিয়ে সে বলে, এ তো ভারী মুশকিলের কথা হল।

রঘু হেসে বলে, ভড়কে গেলি তো ? চুপ করে থাক না কদিন। তড়কানি খেলছে ওরা, যুদ্ধ লেগেছে খবর এয়েচে কিনা তাই ভেবেছে তড়কিয়ে দিয়ে মেরে নেবে ফাঁকতালে। শালার বউয়ের মাই কিনা চাল, বারো টাকা মন বেচতে চান যুদ্ধর নামে। কোথায় যুদ্ধ, কোথায় কী, মোর পাস্তায় নেই কো ঘি। যেমন হাবা তুই, ঘাপটি মেরে থাক না বসে চুপটি করে দশটা দিন ?

চাল যে বাড়ন্ত ঘরে, কিছু বোঝ না তুমি।

চাল বাড়ন্ত, চাল নে যা দু কুনো। কথা কীসের অত ?

রেজকি যখন সবে কর্পূরের মতো উড়ে যেতে আরম্ভ করেছে বাজার থেকে, গৌরের চাঁদকাকা একদিন শম্ভু সার দোকানে যায় তার মেয়ে পুঁটুর পায়ের মল সারাতে। ফিরে সে আসে চাপা উত্তেজনা আর মলের বদলে টাকা নিয়ে, কাগজের টাকা অবশ্য।

পুঁটু পোঁ করে কান্না ধরতেই চাঁদ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে চাপা গলায় গর্জাতে থাকে, চুপ যা, চুপ যা বলছি হারামজাদি। টুঁ শব্দটি করবি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

মেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করলে মুখ থেকে হাত সরিয়ে চাঁদ শুধোয়, কান্না কীসের শুনি ?

পুঁটু বলে, মল কই মোর ? মল এনে দাও মোকে।

সারাতে দিলাম যে মল ?

পুঁটু সন্দিগ্ধ ভাবে বলে, তবে যে বললে মাকে মল বেচে টাকা এনেছ ?

কই বললাম ? বলিনি তো। কী বললাম তুই কী শুনলি আবাগির বেটি। মেয়ের সন্দেহ উড়িয়ে দেবার জন্য জোর করে সস্নেহ কৌতুকের হাসি হাসে, মেয়েকে কাছে টেনে তার মাথা চাপড়ে বলে, পরশু মল এনে দেব তোর, পরশু। হাঁ দ্যাখ মলের রসিদ দিয়েছে শম্ভু সা।

পকেট থেকে একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বার করে চাঁদ মেয়েকে দেখায়। তারপর আর বিলম্ব না করে ঢকঢক করে আধঘটি জল খেয়ে যায় পাশের বাড়িতে কালাচাঁদের কাছে।

কালাচাঁদের অবস্থা বড়ো শোচনীয়। ক বছর আগেও তার অবস্থা এখানকার অনেকের চেয়ে ভালো ছিল, সারা বছর একটি দিনের তরেও বউ ছেলেমেয়ের তার পেটভরা খাবারের অভাব হয়নি। জোতদার করালী শাসমলের অতি বড়ো একটা অন্যায় মেনে নিয়ে আপস করতে রাজি না হওয়ায় তার হয়ে গেল সর্বনাশ, মামলা মকদ্দমায় আর একদিন অন্ধকার রাতে অজানা কার লাঠির আঘাতে ডান হাতটা দু জায়গায় ভেঙে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাওয়ায়। কপাল মন্দ হলে যে সবদিক দিয়ে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে তার প্রমাণও কালাচাদ পেয়েছে, রোগের বাড়াবাড়িতে। অসুখ বিসুখ আগেও তার সংসারে ছিল, সব সংসারে যেমন থাকে, যার তাল সামলাতে রীতিমতো খানিকটা বেগ পেতে হয় শুধু, কিন্তু দিন খারাপ পড়ার সঙ্গে জগতের সব রোগ যেন ভিড় করে আসছে শুধু তারই বাড়িতে !

চাঁদ তাকে বলে, ঘেঁটুর মা কেমন আছে আজ কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদ বাঁ হাতে চোখ কচলে একটা অস্ফুট শব্দ করে, কথার চেয়ে মানে যার বেশি স্পষ্ট।

চাঁদ একেবারে তামাক সেজে থেলো হুঁকোয় কলকে বসিয়ে টানতে টানতে এসেছিল, দাওয়ায় উবু হয়ে বসে হুঁকোটা সে এগিয়ে দেয় কালাচাঁদকে। খানিক এ কথা সে কথা বলে নিয়ে শুধোয়, পঁইছেটা বেচে দেবে শুনছিলাম, দিয়েছ নাকি ভায়া ?

দু বছর যার সঙ্গে সে কথা কয়নি আজ তাকে চাঁদ ভায়া বলে !

দেব আজকালের মধ্যে !

অ্যাদ্দিন বেচোনি ওটা, এ বড়ো আশ্চর্য !

ঘেঁটুর মা লুকিয়ে রেখেছিল। নিশ্চিত মরবে জেনে ভয় পেয়ে তবে না ফাঁস করলে। ওটা বেচে ডাক্তার আনব, ওকে বাঁচাব, শখ কত বাঁচার ! ডাক্তার এসে বাঁচিয়ে দেছে আমার নকড়ি, সাতকড়িকে, জন্মের মতো বাঁচিয়ে দেছে ! এবার এসে বাঁচাবে ওকে !

হুঁকোয় জোরে টান দিতে গিয়ে কাশির ধমকে দম আটকে আসবার উপক্রম হয় কালাচাঁদের, এক হাত হাড়-পাঁজর বার করা শীর্ণ বুকটা চেপে ধরার জন্য তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখতে গিয়ে হুঁকোটা কাত হয়ে কলকের আগুন ছড়িয়ে যায়।

বেচবে যখন, দাও, আমিই কিনেনি। কালাচাঁদ একটু সুস্থ হলে চাঁদ বলে, কিনতে একটা হবে আমার পুঁটুর জন্যে, পঁইছে পঁইছে করে খেপে গেছে একদম। বড়োও হয়েছে, বিয়ে শিগগির না দিলে নয়। তা ভাবছি কী, বিয়ের সময় করতে হবে একটা, দুদিন আগেই কিনি, মেয়েটা বায়না ধরেছে যখন। মজুরি বাদে যা পড়েছিল তোমার তাই দেবখন। রুপো আছে কতটা ওতে ?

কালাচাঁদ চুপ করে থাকে। তার পক্ষে উৎসাহের একান্ত অভাবটা বড়ো খাপছাড়া, বড়ো বিচ্ছিরি লাগে চাঁদের।

নগদ দেব—সব টাকা নগদ। বাকি কিছু রাখব না।

রুপোর দর খুব চড়েছে শুনলাম ?

কথা শুনে চাঁদের বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

গৌর যাচ্ছিল কাল রাস্তা দিয়ে, ডেকে বললাম, ও বাবা গৌর, পঁইছেটা বেচে দিবি বাবা কারও কাছে, দুটো টাকা যাতে বেশি পাই ? গৌর বললে রুপোর দাম বেড়েছে, দেড়গুণ দুগুণ টাকা। সা-র দোকানে দর কষিয়ে গৌর নিজে কিনবে বললে পঁইছেটা। বলি বিয়ে টিয়ে করবে নাকি ভাইপো তোমার ?

কি জানি।

শুধিয়েছিলাম। তা চাপা দিয়ে দিলে কথাটা। মন লাগে কি, বিয়ে টিয়ে করবে নয়তো পঁইছে দিয়ে কি করবে ও, বউ আছে না বোন আছে না মেয়ে আছে ওর ? জোয়ান ছেলে, তুমি তো দিলে না, পিথক হয়ে নিজেই জোগাড় করেছে বিয়ের। ছেলেটা ভালো চাঁদ, ওর ভালো হবে। দেখে নিয়ো ভালো হবে তোমার ভাইপোর।

সবাই তবে জানে রুপোব দাম চড়ার খবর ? কেন সবাই জানল ভেবে বুকটা জ্বলে যেতে থাকে চাঁদের। সে একা না জেনে কেন সবাই জানল !

জ্বলতে জ্বলতে একটা কথা স্মরণ করে মনটা তার শান্ত হয়। মল কিনে সা তাকে শুধিয়েছিল, কাঁচা টাকা আছে চাঁদ ? থাকলে এনো। কাঁচা রুপোর পুরোনো টাকা, এডোয়ার্ড মার্কা, রানি মার্কা টাকা। চাঁদ জানে তারই বাড়ির ঘরের ভিটিতে মাটির তলায় পোঁতা আছে এক ঘটি পুরোনো টাকা, তার বুড়ি শাশুড়ির চাটাই কাঁথার বিছানার নীচে।

প্রায় চার কুড়ি বয়স হবে চাঁদের শাশুড়ির, কাঁকাল বাঁকা হয়ে সামনে নুয়ে গেছে, লোল চামড়া ঢাকা কঙ্কালসার দেহটা, লাঠি ধরে ছাড়া দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তবু এই একভাবে বুড়ি দিব্যি টিকে আছে চাঁদের বাড়িতে আজ পাঁচ বছর। তবু, টাকা ভরা ঘটিটা কোলে রেখেই বুড়িকে একদিন স্বর্গে যেতে হবে জেনে এতদিন চাঁদ নিশ্চিন্ত ছিল। ধরলে গেলে ও টাকা তো তার নিজেরই সঞ্চয় বলা যায়।

সারাদিন চাঁদ চঞ্চল হয়ে থাকে ঘটিটার কথা ভেবে। একটা টাকার দাম হয়েছে এক টাকার বেশি, এমন কথা শুনেছে কেউ কোনোদিন ? এমন সুযোগ এসেছে কোনো কালে ? কে জানে কদিন থাকবে এই সুযোগ ? আর শুধু কি এই একটা সুযোগ ? রুপোর গয়নার কথাটাই ধর। সত্যি সত্যি কি আর দেশসুদ্ধ লোক জেনে গেছে রুপোর দাম চড়বার খবর, রেলের কাছে মধুবনী বড়ো জায়গা, এখানে হয়তো জানাজানি হয়ে গেছে। দূরে ছোটো ছোটো গাঁয়ে হয়তো খবর পৌঁছায়নি এ ব্যাপারের। মধুবনীরও সবাই হয়তো জানে না। গৌর চালাক চতুর, বাজারে যাতায়াত আছে, দশটা লোকের সঙ্গে মেলামেশা আছে, ওরা জানতে পারে। সবাই কি ওদের মতো মধুবনীর ? বোকাহাবা লোক কি নেই এখানে ? রুপোর পুরোনো টুকিটাকি গয়না যদি সে কিছু কিনতে পারে ওদের কাছে থেকে।

মাটির টাকাগুলো যাকে বেচে লাভ হবে, টাকার বদলে পাওয়া বেশি টাকাটা এ ভাবে খাটিয়েও তার লাভ হবে !

চাষি চাঁদের মনে এই সব চিন্তা পাক খেয়ে বেড়ায়—অনভ্যস্ত এলোমেলো চিন্তা বলে একেবারে উতলা করে দেয় তাকে। রূপোর মল বেচে আশাতীত লাভ করেছে বলে শুধু এই পণ্যটির কথাই সে ভাবে, আরও কত কিছু কেনাবেচার মধ্যেও যে এ রকম লাভের সুযোগ দেখা দিয়েছে সে সব তার মনেও আসে না, সোনার কথাটা পর্যন্ত নয় !

দেখা গেল, বুড়ির ঘটি চুরি করার কাজটা মোটেই সহজ নয়। ঘর ছেড়ে বুড়ি বড়ো একটা কোথাও নড়ে না। বেশির ভাগ সময় ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকে, বাকি সময়টা ঘরেরই সামনে দাওয়ায় উবু হয়ে দু পায়ের হাঁটু মাথায় ঠেকিয়ে বসে থাকে, কখনও আপন মনে বিড়বিড় করে, কখনও কাঁপা গলায় তারস্বরে চেঁচিয়ে একে ওকে গাল দেয়। নাইতে খেতে ও প্রকৃতির তাগিদে বুড়িকে অবশ্য সরে যেতে হয় কিছু কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু চাঁদ ভরসা পায় না ! বিছানা তুলে মাটি খুঁড়ে আবার গর্ত বুজিয়ে এমন ভাবে বিছানা পেতে রাখতে হবে, বুড়ির যাতে সন্দেহ না হয়। বুড়ির অনুপস্থিতির সময়টুকুতে সেটা সম্ভব নয়।

চণ্ডীতলায় পুজো দিতে যাবে বলছিলে না মা ? তা যাও না, দিয়ে এসো পুজো। চাঁদ বুড়িকে জপায়।

হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বুড়ি বলে, মাথায় থাক পুজো দেওয়া। অদ্দুর কি চলতে পারি ? তুই যা না বাপ, দিয়ে আয় না পুজোটা ?

বুড়ো মানুষ, সাধ হয়েছে, ডুলি করেই যাও। ডুলির পয়সা দেবখন আমি। বিন্দেকে বলে দিচ্ছি।

ডুলি চেপে চণ্ডীতলায় পুজো দিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বুড়ি চাঁদকে দিয়েই ঘরের দরজায় কুলুপ আঁটায়। শিকল কপাটের নীচের দিকে, কুলুপটা বুড়ি আবার নিজে টেনে দ্যাখে ঠিক মতো লাগল কিনা !

ডুলি ভাড়া গচ্চা যাবার দুঃখের সঙ্গে নতুন নির্ঘাত মতলব ঠাউরাবার চেষ্টায় মাথা ঘামানোর পরিশ্রম মিশে প্রায় কাবু করে আনে চাঁদকে। ভাবতে হয় একা, বউয়ের সঙ্গে যে একটু পরামর্শ করবে তারও উপায় নেই। যতই হোক, সে তো মেয়ে বুড়ির। বোকা মেয়েমানুষ, হয়তো গন্ডগোল করে বসবে। বুড়ি চণ্ডীতলায় গেলে ছুতো করে বউকে গৌরের বুগ্‌ণা মার খবর আনতে পাঠিয়ে কাজ হাসিল করবে ভেবে রেখেছিল। পুরোনো মরচে ধরা এক কুলুপের জন্য সব ফসকে গেল !

গৌরের গোরুর দুধ কমে গেছে। নীলকণ্ঠবাবু চাঁদের কাছ থেকে এক সের দুধ নেবার ব্যবস্থা করেছেন। এ বাড়িতে দুধ নিতে আসবার কোনো তাগিদ চিন্তামণির ছিল না, কিন্তু সাধ করে গৌরের বাড়ি দুধ নিতে আসবার ভারটা নেওয়ায় এ বাড়িতেও তাকে ঘুরে যেতে হয়। দুজনের বাড়ি বেশি দূরে নয়।

পরদিন সকালে চিন্তামণি এসেছে দুধ নিতে, চাঁদ চেয়ে দ্যাখে কী বিধবা মেয়েটা রুপোর পইঁছে পরেছে বেহায়ার মতো। ঘেঁটুর মার গায়ে যেটা লটকে থাকত এ পইঁছেটাও যেন তারই মতো !

পইঁছে দিল কে ? চাঁদ শুধোয়।

কে দেবে, কিনিছি।

কার কাছে কিনলে ? গৌরের কাছে নাকি ?

অত খোঁজে কাজ কি তোমার ? দুধ নিতে এইছি, দুধ দুয়ে দাও, নিয়ে চলে যাই ! চিন্তামণি ঝাঁঝালো সুরে জবাব দেয়। ঝোঁকের মাথায় সখের বশে পইঁছেটা গায়ে চড়িয়ে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল, ভোরের এই সুন্দর পৃথিবীতে সব মানুষ সব ভুলে তার এই গয়নাটির দিকেই শুধু তাকিয়ে থাকছে হাঁ করে।

তোমার তো বড়ো মুখ বাছা ? বলে চাঁদ চুপ করে যায়।

রাত্রে পুঁটু তার দিদিমার কাছে শোয়। দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে সে কেমন এক খাপছাড়া ভীত কণ্ঠে ডাকে, বাবা।

দুধ দোয়া স্থগিত করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাঁদ বলে, কিরে পুঁটু ?

দিদিমা যেন কেমন করে শুয়ে আছে, দ্যাখোসে বাবা।

ডাক না ?

ঠেললাম তো। নড়েচড়ে না।

তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে গিয়ে একনজর তাকিয়েই চাঁদ টের পায় বুড়ি মরে গেছে। বুকটা তার ধড়াস করে ওঠে, মাথা ঝিমঝিম করে। তার মনে হয় সেই যেন মনে প্রাণে জোরালো কামনা করে করে বুড়িকে মেরে ফেলেছে। আর কী এ মরণ ! রোগবালাই নেই, সাড়াশব্দ হইচই নেই, রাত্রে ঘুমের মধ্যে চুপি চুপি নিঃশব্দে স্বর্গে যাওয়া !

পুঁটু কেঁদে ওঠে, তার মা ছুটে এসে কান্নায় যোগ দেয়, আশেপাশের বাড়ির লোক দু চারজন এসে জুটতে আরম্ভ করে। দুধ আর চিন্তামণির নেওয়া হয় না। বুড়ির শোকে চাঁদের দুধ দেওয়ার শক্তি লোপ পাওয়ার জন্য নয়, যে বাড়িতে সদ্য সদ্য একটা মানুষ মরেছে সে বাড়ি থেকে দুধ নেওয়া চলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখে শুনে চিন্তামণি চলে যায়। ভাবে, গৌরকে খবরটা দিতে হবে।

বুড়িকে পুড়িয়ে এসে চাঁদ খন্তা নিয়ে ঘটি উদ্ধার করতে যায়, পুঁটুর মা ডেকে বলে, ও কী করছ ?

টাকার ঘটিটা বার করি মেঝে থেকে ?

পুঁটুর মা বলে, ওখানে ঘটি কই ? ঘটি নেই ওখানে।

চাঁদ অবাক হয়ে বলে, কোথায় আছে তবে ? এইখানে তো পোঁতা ছিল ঘটি ?

পুঁটুর মা বলে, শোন ইদিকে, বলছি সব। ব্যাপার আছে অনেক। ভূমিকা শুনে মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় চাঁদের। তীব্র জ্বালাবোধের সঙ্গে সে ভাবে আশাভঙ্গের কি শেষ নেই তার ?

পুঁটুর মা বলে, ব্যাপারখানা কি জানো, ঘটি থেকে টাকাগুলো মা বার করে নিয়েছিল। বাবুকে বলে পোস্টাপিসে জমা রেখেছে ও বছর। বলাই ঘোষের ঘর পুড়ে মাটির টাকাগুলো গলে তাল পাকিয়ে গেল না সেবার, মা তখন ভয় পেয়ে গেল।

টাকা তবে আছে ? চাঁদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

আমায় বলনি কেন ?

তুমি যদি গোলমাল কর ?

কিছু হাঙ্গামার পর চাঁদ টাকাগুলি পেল—রুপোর টাকা নয়, নোট। কাগজের নোট।

বিয়ে করা কচি বউকে নিয়ে সংসার করার অস্পষ্ট সাধটা গৌর মামাবাড়ি থেকে আরও জোরালো করে নিয়ে ফিরে আসে। চিন্তামণির শক্ত বাঁধন কেটে নিজেকে সরিয়ে নেবার অস্পষ্ট ইচ্ছাও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিন্তামণির সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেবার কথা ভেবে মনটা বড়ো বেশি কেমন করায় তার ভয় বেড়ে যায়। এ ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে চিন্তামণিই হয়তো শেষে তার সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পাইয়ে দেবে, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যা থাকে কপালে বলে চোখ কান বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মনের অবস্থা তার ঘটিয়ে দেবে চিন্তামণি।

না, এ পিরিত টেনে চলে তার মঙ্গল নেই। সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে চিন্তামণির সঙ্গে।

বড়ো কষ্ট পাবে চিন্তামণি।

অদ্ভুত উল্লাসভরা গর্ব অনুভব করে গৌর। তার জন্য চিন্তামণি পাগলিনি, সে বর্জন করলে বুক চিন্তামণির ভেঙে যাবে, চোখের জল ফেলে ফেলে তার দিন কাটবে, এ কথা ভাবলে টনটনে একটা ব্যথাবোধের সঙ্গে গৌরের পুরুষ মন অহংকারে ভরে যায়।

ভোরে এসে চিন্তামণি শুধোয়, কেমন যেন ভাসাভাসা গা ছাড়া গা-ছাড়া ভাবে শুধোয়, ফিরলে কবে ?

কাল ফিরেছি।

ও। কাল ফিরেছ ?

তারপর চুপ করে থাকে চিন্তামণি, উদাস গম্ভীর মুখে। দুধ দুইতে দুইতে মুখ ফিবিয়ে ফিরিয়ে তাকিয়ে গৌরেব মনটা বিগড়ে যাবার উপক্রম করে। চিন্তামণির এ ভাব তার ভালো লাগে না।

একটা কাজ করবে ? চিঠিখানা পড়ে দেবে আমায় ?

পাঠশালায় পড়া বিদ্যায় টানা হাতে লেখা চিঠি পড়তে গৌর গলদ্ঘর্ম হয়ে ওঠে। চিঠির সিকি অংশের বেশি পাঠোদ্ধার করার ক্ষমতা তার হয় না। দু কান তার ঝাঁঝাঁ করতে থাকে।

চিন্তামণি টের পেয়ে বলে, ওই হয়েছে নাও। আমি তো ভাবছিলাম তুমি পড়তেই জানো কি না ! চাষার ছেলের পড়ার বালাই দিয়ে কাজটা কীসের ?

তারপর তাকে যেতে না বলে, ভালোমন্দ সুখদুঃখের দুটো কথা না কয়ে, চিন্তামণি চলে যায়। তাতে আরও বিগড়ে যায় গৌরের মন।

ঠিক এমনিভাবে কেটে যায় কয়েকটা দিন, দু দণ্ডের জন্য পরস্পরের দেখা হয়ে, ভাসাভাসা দুটো কথার বিনিময় হয়ে, আবেগ ও অন্তরঙ্গতা উহ্য থেকে। একদিকে গৌব স্বস্তি পায়, ভাবে এমনিভাবে চলতে থাকলে, বিনা চেষ্টায় বিনা হাঙ্গামায় সম্পর্ক ভাঙার ব্যাপারটা তাদের চুকে যাবে। অন্যদিকে ভিতরটা তার এক দুরন্ত ব্যথায় হুহু করতে থাকে। চিন্তামণিকে মনে হয় ম্লান, নির্জীব ! কী যেন দুঃখ বয়ে বেড়াচ্ছে সে, কথাবার্তা চালচলন চোখমুখের ভঙ্গি সব যেন তার বদলে গেছে সেই দুঃখের চাপে। ছেলে মরবার পর মেয়েলোকের এ রকম শোকাতুরা মূর্তি হতে দেখেছে গৌর। চিন্তামণিও কি নিজে থেকে সংকল্প করেছে, বুক ফেটে গেলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেবে ?

এমনিভাবে দিন যাচ্ছে, একদিন কালাচাঁদের পঁইছেটা গৌর নিজেই কিনে ফেলল একটা খেয়ালের বশে। বেচবার জন্য সা-র দোকানে পঁইছেটা ওজন করাতে গিয়ে তার মনে হল, চিন্তামণিকে সে কখনও কিছু দেয়নি। চিন্তামণির মনে সে যে ভয়ানক কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছে, তার কাছে এই পঁইছেটা পেলে সে কষ্ট কি কিছু কম হবে না ?

পঁইছেটা কিনে তার মনে হল, এই পঁইছে দেওয়া উপলক্ষে শেষবারের মতো একদিন চিন্তামণিকে একটু আদর করে দুটো মিষ্টি কথা বলা তার উচিত। পরদিন সে তাই নিজে থেকে সেধে চিন্তামণিকে বলল, আজ রাতে যাব ?

যাবে ? যেয়ো।

বৈন চিন্তামণি,

কতকাল তোমারে পত্র লিখি নাই ইহাতে মনে কষ্ট করিবা না নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় পত্র দিতে গৌণ হইল। আমি কাজ করিতেছি জানিবা। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কী দুঃখ পাইয়াছি না খাইয়া উপাস করিয়াছি এখানে পোড়া পেটের জ্বালায় বজ্জাত ডাকাইতগুলার দাসী হইলাম ইহা অদেষ্টে ছিল। কিরূপ হৈচৈ হইয়াছে লম্বা লম্বা কত বাড়ী উঠিয়াছে অবাক কাণ্ড দেখিয়া তুমি চোখের

পলক ফেলিতে পারিবা না। ইহাকে বারাক বলিয়া জানিবা। ইহার মধ্যে গাদায় গাদায় মাতাল গুন্ডা গিজগিজ করিতেছে। আমার মত শতাবধি পোড়াকপালী ঝির কাজ করিতে আসিয়াছে কাহারো ধর্ম্ম নাই সতীত্ব নাই এরূপ কাণ্ড। বয়স হইয়াছে তথাপি আমারে টানাটানি করে কোনমতে ধর্ম্ম রাখিয়াছি। না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছিলাম ইহা ভিন্ন গতি কি। দুইস্থানে বাসন মাজিয়া তেরো টাকা করিয়া ছাব্বিশ টাকা পাই। যেরূপ কাণ্ড তোমারে আসিতে বলিতে ভরসা পাই না।

ইতি—তোমার দিদি

গৌরের ঘরে আজ আবার চাল নেই।

মা বলে, ও বেলা হাঁড়ি চড়বে না গৌর। চাল বাড়ন্ত।

আরও কয়েকদিন চলত, পুঁটুকে না খাওয়াতে হলে। কী ভাতটাই খায় এতটুকু মেয়ে ! কম দিয়ে এড়িয়ে যাবার জো নেই, যতক্ষণ না পেট ভরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদে চলবে ভাতের জন্য। পেটমোটা ক্যাংটা পুঁটুর দিকে চেয়ে গৌরের মনে আজ আপশোশ জাগে যে চাঁদকাকা তার না খেয়ে মরে গেছে। বেঁচে থেকে আরও কিছুকাল তিলে তিলে তার মরা উচিত ছিল। বউ আর ছেলে শুধু নয়, এই মেয়েটা চোখের সামনে মরবার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা উচিত ছিল চাঁদকাকার। নিজের আত্মীয় এত বড়ো শত্রু হয় মানুষের ? বেঁচে থাকতে আজীবন শত্রুতা করে গেছে, মরেও শত্রুতা করে গেল।

কতকাল না খেয়ে না খেয়ে পেট চিমসে হয়ে গিয়েছিল পুঁটুর, হঠাৎ দুবেলা বেশি বেশি ভাত গিলে মরতেও সে পারত। উচিত ছিল তাই। অথচ কাণ্ড দ্যাখো অদ্ভুত, কদিনে চেহারা যেন ফিরতে শুরু করে দিয়েছে মেয়েটার। মুখের বীভৎস শীর্ণতা থেকে মৃত্যুর ছাপ মুছে যেতে আরম্ভ করেছে।

পাতে ভাত কম ছিল, রোজ যা খায় তার অর্ধেক। শেষ করে ভাত চাইতে মা একটু ইতস্তত করে, কী যেন বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। তারপর আরও ভাত এনে ঢেলে দিতে যায় গৌরের পাতে।

মার রকম দেখে খটকা লেগেছিল গৌরের মনে, দুহাতে পাত ঢেকে সে বলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আর আছে তো ভাত ?

তুই খা না।

কিন্তু তা কী হয়। মাকে উপোসি রেখে পেট ভরাতে পারার মতো খিদের স্বাদ এখনও গৌর পায়নি। লোভে পড়ে শেষ পর্যন্ত কিছু ধান রঘু আর সে বেচে দিয়েছিল কিন্তু সে খুব বেশি নয়। তাদের দু জনের বাড়িতে তাই এখন পর্যন্ত দুবেলা হাঁড়ি চড়ছে। গৌরের মন মুচড়ে গেছে আতঙ্কে, গোরু ছাগলের মতো চারিদিকে জানাশোনা মানুষগুলিকে মরতে দেখে, দিশেহারা হয়ে পালাতে দেখে দুদিন পরে তার কী অবস্থা হবে এই চিন্তায়। মোটামুটি পেট ভরে খেতে না পেলে হয়তো আতঙ্কে এতটা কাবু হয়ে পড়ত না গৌর। পেটের খিদে তার চিন্তা আর অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিত, বিরামহীন কল্পনার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ এমন পাহাড় হয়ে চেপে বসত না তার মনে।

ধীরে ধীরে গৌর রঘুর বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে। পা তার চলতে চায় না। পর হয়েও এ জগতে রঘুই তার সবচেয়ে আপনার, পরমাত্মীয়ের চেয়ে ঘনিষ্ঠ। তবু আবার রঘুর কাছে ধান বা চাল ধার চাওয়ার কথা ভাবতেও তার কেমন বিশ্রী সংকোচ হচ্ছে। রঘু দুবার তাকে ধার দিয়েছে। মুখ ফুটে দেব না বলেনি কিন্তু শেষবার কেমন যেন বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট মনে হয়েছিল রঘুকে, ধান

মেপে দেবার পর ভালো করে কথা কয়নি। মুখ হাঁড়ি হয়ে গিয়েছিল বিরজার। বাড়ির অন্য সকলের কথায় ব্যবহারেও একটা চাপা শত্রুতার ভাব গৌর অনুভব করেছিল।

কিন্তু উপায় কী। পয়সা কড়ি কিছুই নেই গৌরের হাতে। চিন্তামণিকে পঁইছে কিনে দেবার শখ না জাগলে হয়তো গোটা কয়েক টাকা থাকত তার হাতে, আজ আবার গিয়ে হাত পাততে হত না রঘুর কাছে।

রঘু তামাক টানছিল দাওয়ায় বসে, চিন্তিত গম্ভীর মুখে। উঠানের এক কোণে মাঝারি পাত্রটায় ধান সেদ্ধ হচ্ছে। সুমিষ্ট চেনা গন্ধে গৌরের পেটের অল্প দুটি ভাত যেন চোখের পলকে হজম হয়ে গিয়ে দুর্দান্ত খিদে পাক দিয়ে ওঠে। তাকে দেখে রঘু বিশেষ খুশি হয়েছে মনে হয় না গৌরের। হুঁকোটা দিয়ে অভ্যর্থনা করতেও সে যেন ভুলে গেছে। গৌরের মনে পড়ে, গতবার ধান দেবার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি বারের জন্যও রঘু খবর নিতে যায়নি সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে।

গলা শুকিয়ে যায় গৌরের। আরও একটা নতুন আতঙ্ক তাকে প্রায় দিশেহারা করে দেয়। রঘুও কি সত্যই তাকে ত্যাগ করবে তার বিপদের দিনে ? নিজেকে কী যে অসহায় মনে হয় গৌরের ! আজ সে ভালো করে টের পায়, চিরটা কাল সে কতখানি নির্ভর করে এসেছে রঘুর ওপর, এখনও সে কতটা ভরসা রাখে ওর কাছে। ধান আজ চাইবে কি চাইবে না ভেবে পায় না গৌর। ধান চাইলে যদি ভেঙে যায় তাদের বন্ধুত্ব, সম্পর্ক চুকে যায় আজ থেকে ? যদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সত্যটা যে সাহায্য দূরে থাক, রঘুর কাছ থেকে সহানুভূতি পাবার আশাও তার নেই ? অথচ কথাটা আজ স্পষ্ট করে নিলেই বা তার লাভ কি ! রঘু যদি তাকে বরবাদ করেই থাকে, সেটা জানলে তার কী আর বেশি ক্ষতি হবে ?

এলোমেলো ছাড়া ছাড়া কথা হয় দু জনে। নিজেই হাত বাড়িয়ে গৌর হুঁকোটা নেয়।

বলে, কদিন চলবে আর এ রকম ?

রঘু বলে, ভগমান জানে। নিতায়ের মেয়েটা নাকি কোথায় ভেগেছে কাল।

মাইরি বলছিস ? কার সাথে গেল ?

ভগমান জানে। পটল নাকি পিছনে ছিল শুনলাম—শহরে সরিয়েছে।

বিরজা এসে ঘুরে যায়। ধান কেমন সেদ্ধ হচ্ছে দেখতে। খানিক পরে আবার আসে। মনের কথাটা ধৈর্য ধরে সে চেপে রাখতে পারে না।

কি সলা হচ্ছে শুনি তোমাদের ? ধান যদি চাইতে এসে থাকো গৌর ঠাকুরপো---

গৌর সজোরে মাথা নাড়ে।—না, ধান চাইতে আসিনি। তারপর অন্তরঙ্গের মতো হাসবার চেষ্টা করে বলে, চাই যদি, দেবে না ? বলো কি গো ! আমি চাইলে দেবে না ?

এ যেন তামাশার ব্যাপার !

বিরজা বলে, থাকলে কি দিতে অসাধ ? কোথায় পাব যে তোমায় দেব ! আধপেটা খাচ্ছি সব—মুঠি মেপে চাল নিচ্ছি।

তবু গৌর কথাটাকে গায়ের জোরে তামাশার পর্যায়ে রাখতে চেষ্টা করে, হালকা হাসির ভান করে বলে, আমার জন্যেও নিয়ো বৌঠান আজ থেকে। বিশ মুঠো নিয়ো, তাতেই হবে, বেশি চাই না।

রঘু বলে, ধান যদি কিছু জোগাড় করতে পারিস গৌর---

জোগাড় কীসের ? গোলা ভর্তি ধান রয়েছে।

তামাশা নয় ! ধান পেলে কিছু কিছু শোধ দিস তোর কাছে যা পাব।

বিরজা যোগ দেয়, একটা পেট তোমার—মা বুড়ি আর কতই বা খায় ? তোমার ভাবনা কী বল। এত লোকের সংসার হলে টের পেতে !

গৌর তবু হাসে।—বড়োলোকের বড়ো সংসার ! আমার মতো বড়োলোক যদি হতে—

মন এদিকে তার পুড়ে যেতে থাকে। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে সে একরকম পালিয়ে আসে রাস্তায়।

দুপুরের রোদে যেন উজ্জ্বলতা নেই, শুধু ঝাঁঝ। দু চারটি জীবন্ত কঙ্কাল শুধু চোখে পড়ে—মানুষ ও গোরুছাগল, ঘোষেদের কেলো কুকুরটা মরে পড়ে আছে আস্তাকুঁড়ের ধারে। চাঁদকাকা আর কালাচাঁদের শূন্য ভিটে খাঁখাঁ করছে। চারিদিকের প্রাণহীন স্তব্ধতায় নিজেকে গৌরের আরও বেশি একা, আরও বেশি অসহায় মনে হয়।

মনে হয়, চিন্তামণির সঙ্গে যদি ভাব রাখত ! প্রাণখুলে মনের দুটো কথা কয়ে নিজেকে হালকা করা যেত একটু। আজ তিন-চারমাস চিন্তামণির সঙ্গে সে দেখা করেনি, কথা কয়নি। রঘু আজ যে ভাবে বর্জন করেছে তাকে, একরকম এমনি ভাবেই সেও সম্পর্ক তুলে দিয়েছিল চিন্তামণির সঙ্গে। অবশ্য পঁইছেটা সে দিয়েছিল চিন্তামণিকে—দামি ভারী একটা পঁইছে ! সে চাওয়ার আগেই রঘু তাকে জানিয়ে দিয়েছে ধান সে তাকে দিতে পারবে না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মতো সেই সঙ্গে ধার দেওয়া ধান শোধ চাইতেও তার বাধেনি।

আচ্ছা, চিন্তামণির কাছে সে যদি পঁইছেটা ফেরত চায় ? যদি বলে যে এখনকার মতো ওটা ফেরত দাও, সুদিন ফিরে এলে আবার তোমায় নতুন পঁইছে গড়িয়ে দেব ?

বিয়ে করে ঘরসংসার করার সাধ মেটাবে বলে যাকে সে ত্যাগ করেছে, এতকাল একটা খবরও নেয়নি যে বাঁচল না মরল, তার কাছে পঁইছে ফেরত চাওয়ার কথা ভাবতে গৌরের লজ্জা বোধ হয় না। রঘুর কাছে ধান চাইতে যাওয়ার চেয়ে এ কাজটা বরং ঢের বেশি সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এমন কী, পঁইছে দিতে চিন্তামণি যে অস্বীকার করতে পারে এটা তার খেয়ালও হয় না একবারের জন্য। তার যেন দাবি আছে পঁইছেটাতে এবং চাইলেই যেন চিন্তামণি বিনা দ্বিধায় সেটা তাকে ফিরিয়ে দেবে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই এতটুকু। অসংগতিও নেই।

চিন্তামণির সঙ্গে ভাব হবার পর আজ প্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে গৌর তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। এমন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে যে বাবুদের বাড়ির খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে বাবুর মেয়েটাকেই অনুরোধ জানায় চিন্তামণিকে ডেকে দিতে।

চিন্তামণি আসে অনেক দেরি করে। একটু রোগা হয়ে গেছে চিন্তামণি। রোগা হওয়ায় আরও যেন সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে, কম মনে হচ্ছে বয়স।

চিন্তামণি এসে গৌর মুখ খুলবার আগেই প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে, বেশ করেছ এসেছ। তোমায় খুঁজছিলাম কদিন থেকে। তোমার গয়না ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

চিন্তামণি পঁইছেটা গৌরের হাতে তুলে দেয়।

ফিরিয়ে দিচ্ছ ? কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ ?

যে ব্যাভারটা করলে তুমি, তারপর তোমার জিনিস নেব ? চিন্তামণির গলা ধরে আসে, মাসকাবারে দেশে ফিরে যাব। তোমার জিনিস তোমার থাক, আমার কাজ নেই ওতে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে গৌর চিন্তামণির হাত চেপে ধরে, মিনতি করে বলে যে চিন্তামণি যদি তাকে ছেড়ে দেশে চলে যায় সেও তাহলে বিবাগি হয়ে বেরিয়ে যাবে ঘর ছেড়ে নয়তো আত্মঘাতী হবে। আর সে এমন ব্যবহার করবে না চিন্তামণির সঙ্গে। চিন্তামণি মাপ করুক তাকে।

দুপুরবেলা খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে গৌরের কথা শুনতে শুনতে চিন্তামণির মনে হয় সে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন মনে হলেও রোমাঞ্চ হয় চিন্তামণির।

পঁইছের টাকায় কিছুদিন গেল। তারপর গেল জমিজমা ঘরদুয়ার বাসনপত্র। তারপর গেল পুঁটু ও গৌরের মা।

চিন্তামণি বলল, এখানে থেকে কেন শুকিয়ে মরবে ? তার চাইতে চলো বড়নিছিপুরে দিদির কাছে যাই। মস্ত কারখানা হয়েছে, তুমি কাজ করবে আমি কাজ কবব, একরকম করে চালিয়ে নেব দুজনে মিলে। সেথায় তো জানা চেনা কেউ নেই তোমার, একসাথে থাকতে ভয় পাবে না তুমি।

গৌর বলল, ভয় ? কীসের ভয় ? এখানেই একসাথে থাকছি এসো না আজ থেকে।

আজ গৌরের আত্মীয় নেই, ঘরবাড়ি নেই, জমিজমা নেই, পেটে ভাত নেই--- কাকে তার ভয়, কীসের তার লজ্জা।

বড়নিছিপুর

বৈন চিন্তামণি,

তুমি আসিতেছ জানিয়া কিরূপ সুখী হইয়াছি তাহা কিরূপে বলিব। মনে খালি ডর পাই যে তোমার কাঁচা বয়স, পুরুষ রক্ষক না থাকিলে না জানি কি বিপদে পড়িবা।.....